ছুটির পড়া।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম,
বোলপুর।

মূল্য বার আনা।

PUBLISHED BY Manoranjan Banerjee from
Hitabadi Library.
Printed by N. B. Dass at the Hitabadi Press
70, Colootola Street, CALCUTTA.
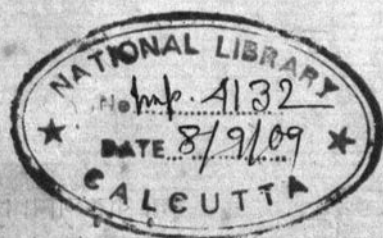
ছুটির পড়া।

ছুটির দিনে।

ঐ দেখ মা আকাশ ছেয়ে
মিলিয়ে এল আলো ;
আজ্‌কে আমার ছুটোছুটি
লাগ্‌ল না আর ভালো !
ঘণ্টা বেজে গেল কখন্‌
অনেক হল বেলা,
তোমায় মনে পড়ে গেল
ফেলে এলেম খেলা !
আজকে আমার ছুটি, আমার
শনিবারের ছুটি !

কাজ যা আছে সব রেখে আয়
মা তোর পায়ে লুটি
দ্বারের কাছে এইখানে বোস্
এই হেথা চৌকাঠ,
বল্ আমারে কোথায় আছে
তেপান্তরের মাঠ।
ঐ দেখ মা বর্ষা এল
ঘনঘটায় ঘিরে,
বিজুলি ধায় এঁকে বেঁকে
আকাশ চিরে চিরে!
দেবতা যখন ডেকে ওঠে
থর্থরিয়ে কেঁপে
ভয় কর্তেই ভালবাসি
তোমায় বুকে চেপে!
ঝুপঝুপিয়ে বৃষ্টি যখন
বাঁশের বনে পড়ে
কথা শুন্তে ভালবাসি
বসে কোণের ঘরে।
ঐ দেখ মা জান্লা দিয়ে
আসে জলের ছাঁট,

ছুটির দিনে।

বল্‌গো আমায়, কোথায় আছে
তেপান্তরের মাঠ!
কোন্ সাগরের তীরে মাগো
কোন পাহাড়ের পারে,
কোন্ রাজাদের দেশে মাগো
কোন নদীটির ধারে!
কোন্ খানে আল্ বাঁধা তার
নাই ডাইনে বাঁয়ে?
পথদিয়ে আর সন্ধ্যেবেলায়
পৌঁছে না কেউ গাঁয়ে?
সারাদিন কি ধূ ধূ করে
শুক্‌নো ঘাসের জমি?
একটি গাছে থাকে শুধু
ব্যাঙ্গমা বেঙ্গমি?
সেখান দিয়ে কাঠ কুড়নি
যায় না নিয়ে কাঠ?
বল্ গো আমায় কোথায় আছে
তেপান্তরের মাঠ?
এমনিতর মেঘ করেছে
সারা আকাশ ব্যেপে,

রাজপুত্তুর যাচ্ছে মাঠে
একলা ঘোড়ায় চেপে
গজমোতির মালাটি তার
বুকের পরে নাচে।
রাজপুত্তুর কোথায় আছে
খোঁজ পেলে কার কাছে?
মেঘে যখন ঝিলিক্ মারে
আকাশের এক কোণে
দুয়োরাণী মায়ের কথা
পড়ে না তার মনে?
দুখিনী মা গোয়াল ঘরে
দিচ্চে এখন ঝাঁট,
রাজপুত্তুর চলে যে কোন্
তেপান্তরের মাঠ?
ঐ দেখ মা গাঁয়ের পথে
লোক নেইক মোটে,
রাখাল ছেলে সকাল করে
ফিরেছে আজ গোঠে।
আজকে দেখ রাত্তির হল
দিন না যেতে যেতে

কৃষাণেরা বসে হু
দাওয়ায় মাছুর পেতে।
আজ্‌কে আমি লুকিয়েছি মা
পুঁথিপত্তর যত,—
পড়ার কথা আজ বোলোনা!
যখন বাবার মত
বড় হব, তখন আমি
পড়ব প্রথম পাঠ,—
আজ্‌ বল মা কোথায় আছে
তেপান্তরের মাঠ!

মুকুট।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ত্রিপুরার রাজা অমর মাণিক্যের কনিষ্ঠ পুত্র রাজধর সেনাপতি ইষা খাঁকে বলিলেন—"দেখ সেনাপতি, আমি বরাবর বলিতেছি তুমি আমাকে অসম্মান করিও না।"

পাঠান ইষা খাঁ কতকগুলি তীরের ফলা লইয়া তাহাদের ধার পরীক্ষা করিতেছিলেন। রাজধরের কথা শুনিয়া কিছুই বলিলেন না, কেবল মুখ তুলিয়া ভুরু উঠাইয়া একবার তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন। আবার তখনি মুখ নত করিয়া তীরের ফলার দিকে মনোযোগ দিলেন।

রাজধর বলিলেন—"ভবিষ্যতে যদি তুমি আমার নাম ধরিয়া ডাক তবে আমি তাহার সমুচিত প্রতিবিধান করিব।"

বৃদ্ধ ইষা খাঁ সহসা মাথা তুলিয়া বজ্রস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"বটে!"

রাজধর তাঁহার তলোয়ারের খাপের আগা মেঝের পাথরের উপরে ঠক করিয়া ঠুকিয়া বলিলেন "হাঁ।"

ইষা খাঁ বালক রাজধরের বুক-ফুলানর ভঙ্গী ও তলোয়ারের আস্ফালন দেখিয়া থাকিতে পারিলেন না—হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। রাজধরের সমস্ত মুখ, চোখের সাদাটা পর্য্যন্ত লাল হইয়া উঠিল।

ইষা খাঁ উপহাসের স্বরে হাসিয়া হাত যোড় করিয়া বলিলেন "মহামহিম মহারাজাধিরাজকে কি বলিয়া ডাকিতে হইবে? হুজুর, জনাব, জাঁহাপনা, শাহেন্ শা—"

রাজধর তাঁহার স্বাভাবিক কর্কশ স্বর দ্বিগুণ কর্কশ করিয়া কহিলেন—"আমি তোমার ছাত্র বটে, কিন্তু আমি রাজকুমার—তাহা তোমার মনে নাই!"

ইষা খাঁ তীব্রস্বরে কহিলেন—"বস্! চুপ্! আর অধিক কথা কহিও না! আমার অন্য কাজ আছে।" বলিয়া পুনরায় তীরের ফলার প্রতি মন দিলেন।

এমন সময় ত্রিপুরার দ্বিতীয় রাজপুত্র ইন্দ্রকুমার তাঁহার দীর্ঘপ্রস্থ বিপুল বলিষ্ঠ দেহ লইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। মাথা হেলাইয়া হাসিয়া বলিলেন "খাঁ সাহেব, আজিকার ব্যাপারটা কি!"

ইন্দ্রকুমারের কণ্ঠ শুনিয়া বৃদ্ধ ইষা খাঁ তীরের ফলা রাখিয়া সস্নেহে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন-হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"শোন্ ত বাবা, বড় তামাসার কথা! তোমার এই কনিষ্ঠটিকে—মহারাজ চক্রবর্ত্তীকে জাঁহাপনা জনাব বলিয়া না ডাকিলে উঁহার

অপমান বোধ হয়!" বলিয়া আবার তীরের ফলা লইয়া পড়িলেন।

"সত্য না কি!" বলিয়া ইন্দ্রকুমার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

রাজধর বিষম ক্রোধে বলিলেন—"চুপ কর দাদা!"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন—"রাজধর, তোমাকে কি বলিয়া ডাকিতে হইবে?" জাঁহাপনা! হা হা হা হা!"

রাজধর কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন—"দাদা চুপ কর বলিতেছি।"

ইন্দ্রকুমার আবার হাসিয়া বলিলেন—"জনাব!"

রাজধর অধীর হইয়া বলিলেন "দাদা তুমি নিতান্ত নির্ব্বোধ!"

ইন্দ্রকুমার হাসিয়া রাজধরের পৃষ্ঠে হাত বুলাইয়া বলিলেন—"ঠাণ্ডা হও ভাই, ঠাণ্ডা হও। তোমার বুদ্ধি তোমার থাক্! আমি তোমার বুদ্ধি কাড়িয়া লইতেছি না!"

ঈষা খাঁ কাজ করিতে করিতে আড়চোখে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"উঁহার বুদ্ধি সম্প্রতি অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে।"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন "নাগাল পাওয়া যায় না!"

রাজধর গস্‌গস্ করিয়া চলিয়া গেলেন। চলনের দাপে খাপের মধ্যে তলোয়ারখানা ঝন্‌ঝন্ করিতে লাগিল!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রাজকুমার রাজধরের বয়স উনিশ বৎসর। শ্যামবর্ণ, বেঁটে, দেহের গঠন বলিষ্ঠ। সেকালে অন্য রাজপুত্রেরা যেমন বড় বড় চুল রাখিতেন ইহাঁর তেমন ছিল না। ইহাঁর সোজা সোজা মোটা চুল ছোট করিয়া ছাঁটা। ছোট ছোট চোখ, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। দাঁত গুলি কিছু বড়। গলার আওয়াজ ছেলেবেলা হইতেই কেমন কর্কশ। রাজধরের বুদ্ধি অত্যন্ত বেশী এইরূপ সকলের বিশ্বাস, তাঁহার নিজের বিশ্বাসও তাই। এই বুদ্ধির বলে তিনি আপনার দুই দাদাকে অত্যন্ত হেয়জ্ঞান করিতেন। রাজধরের প্রবল প্রতাপে বাড়িশুদ্ধ সকলে অস্থির। আবশ্যক থাক্ না থাক্ একখানা তলোয়ার মাটিতে ঠুকিয়া ঠুকিয়া তিনি বাড়িময় কর্ত্তৃত্ব করিয়া বেড়ান। রাজবাটির চাকর বাকরেরা তাঁহাকে রাজা বলিয়া মহারাজ বলিয়া হাতযোড় করিয়া সেলাম করিয়া প্রণাম করিয়া কিছুতে নিস্তার পায় না। সকল জিনিষেই তাঁহার হাত সকল জিনিষই তিনি নিজে দখল করিতে চান। সে বিষয়ে তাঁহার চক্ষুলজ্জাটুকু পর্য্যন্ত নাই। একবার যুবরাজ চন্দ্রনারায়ণের একটা ঘোড়া তিনি রীতিমত দখল করিয়াছিলেন, দেখিয়া যুবরাজ ঈষৎ হাসিলেন, কিন্তু কিছু বলিলেন না। আর একবার কুমার ইন্দ্রকুমারের রূপার পাত লাগান একটা ধনুক অম্লান বদনে অধিকার করিয়া ছিলেন—ইন্দ্রকুমার চটিয়া বলিলেন—"দেখ যে জমিন হইয়াছি, উহা আমি আর

ফিরাইয়া লইতে চাহিনা, কিন্তু ফের যদি তুমি আমার জিনিষে হাত দাও, তবে আমি এমন করিয়া দিব যে, ও হাতে আর জিনিষ তুলিতে পারিবে না!" কিন্তু রাজধর দাদাদের কথা বড় গ্রাহ্য করিতেন না। লোকে তাঁহার আচরণ দেখিয়া আড়ালে বলিত "ছোটকুমারের রাজার ঘরে জন্ম বটে, কিন্তু রাজার ছেলের মত কিছুই দেখি না।"

কিন্তু মহারাজা অমরমাণিক্য রাজধরকে কিছু বেশী ভাল বাসিতেন। রাজধর তাহা জানিতেন। আজ পিতার কাছে গিয়া ইষাখাঁর নামে নালিস করিলেন।

রাজা ইষা খাঁকে ডাকাইয়া আনিলেন। বলিলেন—"সেনাপতি, রাজকুমারদের এখন বয়স হইয়াছে। এখন উঁহাদিগকে যথোচিত সম্মান করা উচিত।"

"মহারাজ বাল্যকালে যখন আমার কাছে যুদ্ধ শিক্ষা করিতেন তখন মহারাজকে যেরূপ সম্মান করিতাম—রাজকুমারগণকে তাহা অপেক্ষা কম সম্মান করি না!"

রাজধর বলিলেন "আমার অনুরোধ তুমি আমার নাম ধরিয়া ডাকিও না।

ইষা খাঁ বিদ্যুদ্বেগে মুখ ফিরাইয়া কহিলেন—"চুপ কর বৎস! আমি তোমার পিতার সহিত কথা কহিতেছি। মহারাজ, মার্জ্জনা করিবেন আপনার এ কনিষ্ঠ পুত্রটি রাজ-পরিবারের উপযুক্ত হয়

নাই। ইহার হাতে তলোয়ার শোভা পায় না। এ বড় হইলে মুন্সির মত কলম চালাইতে পারিবে—আর কোন কাজে লাগিবে না।"

এমন সময়ে চন্দ্রনারায়ণ ও ইন্দ্রকুমার সেখানে উপস্থিত হইলেন। ইষা খাঁ তাঁহাদিগের দিকে ফিরিয়া বলিলেন "চাহিয়া দেখুন মহারাজ এই ত যুবরাজ বটে! এই ত রাজপুত্র বটে।"

রাজা রাজধরের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"রাজধর, খাঁ সাহেব কি বলিতেছেন? তুমি অস্ত্রবিদ্যায় উঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে পার নাই?

রাজধর বলিলেন, "মহারাজ, আমাদের ধনুর্বিদ্যার পরীক্ষা গ্রহণ করুন, পরীক্ষায় যদি আমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ না হই তবে আমাকে পরিত্যাগ করিবেন! আমি রাজবাটি ছাড়িয়া চলিয়া যাইব।"

রাজা বলিলেন "আচ্ছা, আগামী সপ্তাহে পরীক্ষা হইবে। তোমাদের মধ্যে যিনি উত্তীর্ণ হইবেন, তাঁহাকে আমার হীরক-খচিত তলোয়ার পুরস্কার দিব!"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ইন্দ্রকুমার ধনুর্বিদ্যায় অসাধারণ ছিলেন। শুনা যায় একবার তাঁহার এক অনুচর প্রাসাদের ছাদের উপর হইতে একটা মোহর নীচে ফেলিয়া দেয়, সেই মোহর মাটিতে পড়িতে না পড়িতে তাঁর

মারিয়া কুমার তাহাকে শত হাত দূরে ফেলিয়াছিলেন। রাজধর রাগের মাথায় পিতার সম্মুখে দম্ভ করিয়া আসিলেন বটে, কিন্তু মনের ভিতরে বড় ভাবনা পড়িয়া গেল। যুবরাজ চন্দ্রনারায়ণের জন্য বড় ভাবনা নাই—তীর-ছোঁড়া বিদ্যা তাঁহার ভাল আসিত না কিন্তু ইন্দ্রকুমারের সঙ্গে আঁটিয়া উঠা দায়। রাজধর অনেক ভাবিয়া অবশেষে একটা ফন্দী ঠাওরাইলেন। হাসিয়া মনে মনে বলিলেন—"তীর ছুড়িতে পারি না পারি আমার বুদ্ধি তীরের মত—তাহাতে সকল লক্ষ্যই ভেদ হয়।"

কাল পরীক্ষার দিন। যে জায়গাতে পরীক্ষা হইবে, যুবরাজ, ইষা খাঁ ও ইন্দ্রকুমার সেই জমী তদারক করিতে গিয়াছেন। রাজধর আসিয়া বলিলেন—"দাদা, আজ পূর্ণিমা আছে—আজ রাত্রে যখন বাঘ গোমতী নদীতে জল খাইতে আসিবে, তখন নদীতীরে বাঘ শিকার করিতে গেলে হয় না?"

ইন্দ্রকুমার আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন "কি আশ্চর্য্য! রাজধরের যে আজ শিকারে প্রবৃত্তি হইল? এমন ত কখন দেখা যায় না!"

ইষা খাঁ রাজধরের প্রতি ঘৃণার কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন—"উনি আবার শিকারী নন, উনি জাল পাতিয়া ঘরের মধ্যে শিকার করেন। উঁহার বড় ভয়ানক শিকার। রাজসভায় একটি জীব নাই যে উঁহার ফাঁদে একবার-না-একবার না পড়িয়াছে!"

চন্দ্রনারায়ণ দেখিলেন কথাটা রাজধরের মনে লাগিয়াছে—

ব্যথিত হইয়া বলিলেন—"সেনাপতি সাহেব, তোমার তলোয়ারও যেমন তোমার কথাও তেমনি, উভয়ই শাণিত—যাহার উপরে গিয়া পড়ে, তাহার মর্ম্মচ্ছেদ করে।"

রাজধর হাসিয়া বলিলেন "না দাদা, আমার জন্য বেশী ভাবিও না। খাঁ-সাহেব অনেক শাণ দিয়া কথা কহেন বটে, কিন্তু আমার কাণের মধ্যে পালকের মত প্রবেশ করে।"

ইষা খাঁ হঠাৎ চটিয়া উঠিয়া পাকা গোঁফে চাড়া দিয়া বলিলেন—"তোমার কাণ আছে না কি? তা যদি থাকিত তাহা হইলে এতদিনে তোমাকে সীধা করিতে পারিতাম।" বৃদ্ধ ইষা খাঁ কাহাকেও বড় মান্য করিত না।

ইন্দ্রকুমার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। চন্দ্রনারায়ণ গম্ভীর হইয়া রহিলেন, কিছু বলিলেন না। যুবরাজ বিরক্ত হইয়াছেন বুঝিয়া ইন্দ্রকুমার তৎক্ষণাৎ হাসি থামাইয়া তাঁহার কাছে গেলেন—মৃদুভাবে বলিলেন—"দাদা তোমার কি মত? আজ রাত্রে শিকার করিতে যাইবে কি?

চন্দ্রনারায়ণ কহিলেন—"তোমার সঙ্গে ভাই শিকার করিতে যাওয়া মিথ্যা, তাহা হইলে নিতান্ত নিরামিষ শিকার করিতে হয়। তুমি বনে গিয়া যত জন্তু মারিয়া আন, আর আমরা কেবল লাউ কুম্‌ড়া কচু কাঁঠাল শিকার করিয়া আনি!"

ইষা খাঁ পরম হৃষ্ট হইয়া হাসিতে লাগিলেন—সস্নেহে ইন্দ্রকুমারের

পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন—"যুবরাজ ঠিক কথা বলিতেছেন পুত্র! তোমার তীর সকলের আগে গিয়া ছোটে এবং নির্ঘাত গিয়া লাগে। তোমার সঙ্গে কে পারিয়া উঠিবে।"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন—"না না দাদা ঠাট্টা নয়—যাইতে হইবে। তুমি না গেলে কে শিকার করিতে যাইবে?"

যুবরাজ বলিলেন "আচ্ছা চল। আজ রাজধরের শিকারের ইচ্ছা হইয়াছে উঁহাকে নিরাশ করিব না।"

সহাস্য ইন্দ্রকুমার চকিতের মধ্যে ম্লান হইয়া বলিলেন—"কেন দাদা, আমার ইচ্ছা হইয়াছে বলিয়া কি যাইতে নাই!"

চন্দ্রনারায়ণ বলিলেন—"সে কি কথা ভাই, তোমার সঙ্গে ত রোজই শিকারে যাইতেছি—"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন—"তাই সেটা পুরাতন হইয়া গেছে!"

চন্দ্রনারায়ণ বিমর্ষ হইয়া বলিলেন—"তুমি আমার কথা এমন করিয়া ভুল বুঝিলে বড় ব্যথা লাগে!"

ইন্দ্রকুমার হাসিয়া তাড়াতাড়ি বলিলেন—"না দাদা, আমি ঠাট্টা করিতেছিলাম। শিকারে যাইব না ত কি! চল তার আয়োজন করিগে!"

ইশা খাঁ মনে মনে কহিলেন—"ইন্দ্রকুমার বুকে দশটা বাণ সহিতে পারে, কিন্তু দাদার একটু সামান্য অনাদর সহিতে পারে না!"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

শিকারের বন্দোবস্ত সমস্ত স্থির হইলে পরে রাজধর আস্তে আস্তে ইন্দ্রকুমারের স্ত্রী কমলাদেবীর কক্ষে গিয়া উপস্থিত। কমলাদেবী হাসিয়া বলিলেন "এ কি ঠাকুরপো! একেবারে তীরধনুক বর্ম্মচর্ম্ম লইয়া যে! আমাকে মারিবে না কি?"

রাজধর বলিলেন—ঠাকুরাণী, আমরা আজ তিন ভাই শিকার করিতে যাইব তাই এই বেশ।"

কমলাদেবী আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন—তিন ভাই! তুমিও যাইবে না কি! আজ তিন ভাই একত্র হইবে! এ ত ভাল লক্ষণ নয়! এ যে ত্র্যহস্পর্শ হইল?"

যেন বড় ঠাট্টা হইল এই ভাবে রাজধর হাহা করিয়া হাসিলেন কিন্তু বিশেষ কিছু বলিলেন না।

কমলাদেবী কহিলেন—"না না, তাহা হইবে না—রোজরোজ শিকার করিতে যাইবেন আর আমি ঘরে বসিয়া ভাবিয়া মরি!"

রাজধর বলিলেন—"আজ আবার রাত্রে শিকার!"

কমলাদেবী মাথা নাড়িয়া বলিলেন—"সে কখনই হইবে না। দেখিব আজ কেমন করিয়া যান্।"

রাজধর বলিলেন—"ঠাকুরাণী এক কাজ কর ধনুকবাণগুলি লুকাইয়া রাখ!"

কমলাদেবী কহিলেন—"কোথায় লুকাইব ?"

রাজধর—"আমার কাছে দাও, আমি লুকাইয়া রাখিব।"

কমলাদেবী হাসিয়া কহিলেন "মন্দকথা নয়। সে বড় রঙ্গ হইবে।" কিন্তু মনে মনে বলিলেন "তোমার একটা কি মৎলব আছে। তুমি যে কেবল আমার উপকার করিতে আসিয়াছ তাহা বোধ হয় না।"

"এস অস্ত্রশালায় এস" বলিয়া কমলাদেবী রাজধরকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন। চাবি লইয়া ইন্দ্রকুমারের অস্ত্রশালার দ্বার খুলিয়া দিলেন। রাজধর যেমন ভিতরে প্রবেশ করিলেন অমনি কমলাদেবী দ্বারে তালা লাগাইয়া দিলেন, রাজধর ঘরের মধ্যে বদ্ধ হইয়া রহিলেন। কমলাদেবী বাহির হইতে হাসিয়া বলিলেন "ঠাকুরপো, আমি তবে আজ আসি।" বলিয়া চলিয়া গেলেন।

এদিকে সন্ধ্যার সময় ইন্দ্রকুমার অন্তঃপুরে আসিয়া অস্ত্রশালার চাবি কোথাও খুঁজিয়া পাইতেছেন না। কমলাদেবী হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"হাঁগা, আমাকে খুঁজিতেছ বুঝি, আমিত হারাই নাই।" শিকারের সময় বহিয়া যায় দেখিয়া ইন্দ্রকুমার দ্বিগুণ ব্যস্ত হইয়া খোঁজ করিতে লাগিলেন। কমলাদেবী তাঁহাকে বাধা দিয়া আবার তাঁহার মুখের কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন— হাসিতে হাসিতে বলিলেন— "হাঁগা, দেখিতে কি পাও না? চোখের সম্মুখে তবু বরময় বেড়াইতেছ ?" ইন্দ্রকুমার কিঞ্চিৎ কাতরস্বরে কহিলেন—"দেবি, এখন বাধা দিও না—আমার একটা বড় আবশ্যকের জিনিষ হারাইয়াছে।"

কমলা কহিলেন—"আমি জানি তোমার কি হারাইয়াছে আমার একটী কথা যদি রাখ ত খুঁজিয়া দিতে পারি।"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন—"আচ্ছা রাখিব।"

কমলাদেবী বলিলেন—"তবে শোন। আজ তুমি শিকার করিতে যাইতে পারিবে না, এই লও তোমার চাবি।"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন—"সে হয় না—এ কথা রাখিতে পারি না।"

কমলাদেবী বলিলেন "চন্দ্রবংশে জন্মিয়া এই বুঝি তোমার আচরণ! একটা সামান্য প্রতিজ্ঞা রাখিতে পার না!"

ইন্দ্রকুমার হাসিয়া বলিলেন "আচ্ছা, তোমার কথাই রহিল। আজ আমি শিকারে যাইব না।"

কমলাদেবী—"তোমাদের আর কিছু হারাইয়াছে? মনে করিয়া দেখ দেখি।"

ইন্দ্রকুমার—"কই, মনে পড়ে না ত।"

কমলাদেবী—"তোমাদের সাত-রাজার-ধন মাণিক! তোমাদের সোনার চাঁদ?"

ইন্দ্রকুমার মৃদু হাসিয়া ঘাড় নাড়িলেন। কমলাদেবী কহিলেন "তবে এস, দেখ'সে!" বলিয়া অস্ত্রশালার দ্বারে গিয়া দ্বার খুলিয়া দিলেন। কুমার দেখিলেন রাজধর ঘরের মেঝেতে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন—দেখিয়া হোহো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন—"এ কি, রাজধর অস্ত্রশালায় যে!"

কমলাদেবী বলিলেন—"উনি আমাদের ব্রহ্মাস্ত্র।"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন "ত বটে, উনি সকল অস্ত্রের চেয়ে তীক্ষ্ণ।"

রাজধর মনে মনে বলিলেন—"তোমাদের জিহ্বার চেয়ে নয়।" রাজধর ঘর হইতে বাহির হইয়া বাঁচিলেন।

তখন কমলাদেবী গম্ভীর হইয়া বলিলেন—"না কুমার, তুমি শিকার করিতে যাও। আমি তোমার সত্য ফিরাইয়া লইলাম।"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন—"শিকার করিব? আচ্ছা।" বলিয়া ধনুকে তীর যোজনা করিয়া অতি ধীরে কমলাদেবীর দিকে নিক্ষেপ করিলেন। তীর তাঁহার পায়ের কাছে পড়িয়া গেল—কুমার বলিলেন "আমার লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল!"

কমলাদেবী বলিলেন—"না, পরিহাস না। তুমি শিকারে যাও।"

ইন্দ্রকুমার কিছু বলিলেন না। ধনুর্ব্বাণ ঘরের মধ্যে ফেলিয়া বাহির হইয়া গেলেন। যুবরাজকে বলিলেন—"দাদা আজ শিকারের সুবিধা হইল না। চন্দ্রনারায়ণ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—বুঝিয়াছি!"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আজ পরীক্ষার দিন। রাজবাটির বাহিরের মাঠে বিস্তর লোক জড় হইয়াছে। রাজার ছত্র ও সিংহাসন প্রভাতের আলোতে ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। জায়গাটা পাহাড়ে, উঁচুনীচু—লোকে আচ্ছন্ন হইয়া

গিয়াছে। চারিদিকে যেন মানুষের মাথার ঢেউ উঠিয়াছে। ছেলে গুলো গাছের উপর চড়িয়া বসিয়াছে। একটা ছেলে গাছের ডাল হইতে আস্তে আস্তে হাত বাড়াইয়া একজন মোটা মানুষের মাথা হইতে পাগড়ী তুলিয়া আরেকজনের মাথায় পরাইয়া দিয়াছে। যাহার পাগড়ী সে ব্যক্তি চটিয়া ছেলেটাকে গ্রেফ্তার করিবার জন্য নিষ্ফল প্রয়াস পাইতেছে, অবশেষে নিরাশ হইয়া সজোরে গাছের ডাল নাড়া দিতেছে, ছোঁড়াটা মুখভঙ্গী করিয়া ডালের উপর বাঁদরের মত নাচিতেছে। মোটামানুষের দুর্দ্দশা ও রাগ দেখিয়া সে দিকে একটা হো হো হাসি পড়িয়া গিয়াছে। একজন এক হাঁড়ি দই মাথায় করিয়া বাড়ি যাইতেছিল, পথে জনতা দেখিয়া সে দাঁড়াইয়া গিয়াছিল—হঠাৎ দেখে তাহার মাথায় হাঁড়ি নাই, হাঁড়িটা মুহূর্ত্তের মধ্যে হাতে হাতে কতদূর চলিয়া গিয়াছে তাহার ঠিকানা নাই—দইওয়ালা খানিকক্ষণ হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। একজন বলিল—"ভাই, তুমি দইয়ের বদলে ঘোল খাইয়া গেলে, কিঞ্চিৎ লোকসান হইল বৈ ত নয়!" দইওয়ালা পরম সান্ত্বনা পাইয়া গেল। হারু নাপিতের পরে গাঁ-সুদ্ধ লোক চটা ছিল। তাহাকে ভিড়ের মধ্যে দেখিয়া লোকে তাহার নামে ছড়া কাটিতে লাগিল। সে যত ক্ষেপিতে লাগিল খেপাইবার দল তত বাড়িয়া উঠিল—চারিদিকে চটাপট্ হাততালি পড়িতে লাগিল। আটার প্রকার আওয়াজ বাহির হইতে লাগিল! সে ব্যক্তি মুখ চক্ষু লাল করিয়া চটিয়া গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া, চাদর ভূমিতে

লুটাইয়া, একপাটি চটিজুতা ভড়ের মধ্যে হারাইয়া বিশ্বের লোককে অভিশাপ দিতে দিতে বাড়ি ফিরিয়া গেল। ঠাসাঠাসি ভিড়ের মাঝে মাঝে একেকটা ছোট ছেলে আত্মীয়ের কাঁধের উপর চড়িয়া কান্না জুড়িয়া দিয়াছে। এমন কত জায়গায় কত কলরব উঠিয়াছে তাহার ঠিকানা নাই। হঠাৎ নহবৎ বাজিয়া উঠিল। সমস্ত কোলাহল ভাসাইয়া দিয়া জয় জয় শব্দে আকাশ প্লাবিত হইয়া গেল। কোলের ছেলে যতগুলা ছিল ভয়ে সমস্বরে কাঁদিয়া লঠিল—গাঁয়ে গাঁয়ে পাড়ায় পাড়ায় কুকুর গুলো উর্দ্ধমুখ হইয়া খেউ খেউ করিয়া ডাকিয়া উঠিল। পাখী যেখানে যত ছিল ভয়ে গাছের ডাল ছাড়িয়া আকাশে উড়িল। কেবল গোটাকতক বুদ্ধিমান কাক সুদূরে গাম্ভারী গাছের ডালে বসিয়া দক্ষিণে ও বামে ঘাড় হেলাইয়া একাগ্রচিত্তে অনেক বিবেচনা করিতে লাগিল এবং একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ অসন্দিগ্ধচিত্তে কা কা করিয়া ডাকিয়া উঠিতে লাগিল। রাজা আসিয়া সিংহাসনে বসিয়াছেন। পাত্রমিত্র সভাসদ্গণ আসিয়াছেন। রাজকুমারগণ ধনুর্ব্বাণ হস্তে আসিয়াছেন। নিশান লইয়া নিশানধারী আসিয়াছে। ভাট আসিয়াছে। সৈন্যগণ পশ্চাতে কাতার দিয়া দাঁড়াইয়াছে। বাজন্দারগণ মাথা নাড়াইয়া নাচিয়া সবলে পরমোৎসাহে ঢোল পিটাইতেছে। মহা ধূম প'ড়য়া গিয়াছে। পরীক্ষার সময় যখন হইল, ইষা খাঁ রাজ-কুমারগণকে প্রস্তুত হইতে কহিলেন। ইন্দ্রকুমার যুবরাজকে

কহিলেন—"দাদা, আজ তোমাকে জিতিতে হইবে, তাহা না হইলে চলিবে না !"

যুবরাজ হাসিয়া বলিলেন—"চলিবে না ত কি ! আমার একটা ক্ষুদ্র তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলেও জগৎসংসার যেমন চলিতেছিল তেম্নি চলিবে। আর যদিই বা না চলিত তবু আমার জিতিবার তঃ কোন সম্ভাবনা দেখিতেছি না।"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন—"দাদা তুমি যদি হার ত আমিও ইচ্ছাপূর্ব্বক লক্ষ্যভ্রষ্ট হইব !"

যুবরাজ ইন্দ্রকুমারের হাত ধরিয়া কহিলেন—"না ভাই, ছেলে-মানুষী করিও না—ওস্তাদের নাম রক্ষা করিতে হইবে !"

রাজধর বিবর্ণ শুষ্ক চিন্তাকুল মুখে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ইষা খাঁ আসিয়া কহিলেন—"যুবরাজ. সময় হইয়াছে, ধনুক-গ্রহণ কর।"

যুবরাজ দেবতার নাম করিয়া ধনুক গ্রহণ করিলেন। প্রায় দুইশত হাত দূরে গোটাপাঁচছয় কলাগাছের গুঁড়ি একত্র বাঁধিয়া স্থাপিত হইয়াছে। মাঝে একটা কচুর পাতা চোখের মত করিয়া বসান আছে। তাহার ঠিক মাঝখানে চোখের তারার আকারে কালো চিহ্ন অঙ্কিত। সেই চিহ্নই লক্ষ্যস্থল। দর্শকেরা অর্দ্ধচন্দ্র আকারে মাঠ ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া আছে—যেদিকে লক্ষ্য স্থাপিত সেদিকে যাওয়া নিষেধ।

যুবরাজ ধনুকে বাণ যোজনা করিলেন। লক্ষ স্থির করিলেন।

বাণনিক্ষেপ করিলেন। বাণ লক্ষ্যের উপর দিয়া চলিয়া গেল। ইষা খাঁ তাহার গোঁফ-শুদ্ধ দাড়ি-শুদ্ধ মুখ বিকৃত করিল—পাকা ভুরু কুঞ্চিত করিল। কিন্তু কিছু বলিল না। ইন্দ্রকুমার বিষণ্ণ হইয়া এমন ভাব ধারণ করিলেন, যেন তাঁহাকেই লজ্জিত করিবার জন্য দাদা ইচ্ছা করিয়া এই কীর্ত্তিটি করিলেন। অস্থির ভাবে ধনুক নাড়িতে নাড়িতে ইষাখাঁকে বলিলেন—"দাদা মন দিলেই সমস্ত পারেন কিন্তু কিছুতেই মন দেন না।"

ইষা খাঁ বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"তোমার দাদার বুদ্ধি আর সকল জায়গাতেই খেলে কেবল তীরের আগায় খেলে না, তাহার কারণ, বুদ্ধি তেমন সূক্ষ্ম নয়।"

ইন্দ্রকুমার ভারি চটিয়া একটা উত্তর দিতে যাইতেছিলেন। ইষা খাঁ বুঝিতে পারিয়া দ্রুত সরিয়া গিয়া রাজধরকে বলিলেন—"কুমার, এবার তুমি লক্ষ্য ভেদ কর মহারাজা দেখুন।

রাজধর বলিলেন—"আগে দাদার হউক!"

ইষা খাঁ রুষ্ট হইয়া কহিলেন—"এখন উত্তর করিবার সময় নয়। আমার আদেশ পালন কর।"

রাজধর চটিলেন, কিন্তু কিছু বলিলেন না। ধনুর্ব্বাণ তুলিয়া লইলেন। লক্ষ্য স্থির করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। তীর মাটিতে বিদ্ধ হইল। যুবরাজ রাজধরকে কহিলেন "তোমার বাণ অনেকটা নিকটে গিয়াছে—আর একটু হইলেই লক্ষ্য বিদ্ধ হইত।"

রাজধর অম্লানবদনে কহিলেন—"লক্ষ্য ত বিদ্ধ হইয়াছে দূর হইতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে না।"

যুবরাজ কহিলেন "না রাজধর তোমার দৃষ্টির ভ্রম হইয়াছে, লক্ষ্য বিদ্ধ হয় নাই।"

রাজধর কহিলেন—হাঁ, বিদ্ধ হইয়াছে। কাছে গেলেই দেখা যাইবে।" যুবরাজ আর কিছু বলিলেন না।

অবশেষে ইষা খাঁর আদেশ ক্রমে ইন্দ্রকুমার নিতান্ত অনিচ্ছা সহকারে ধনুক তুলিয়া লইলেন। যুবরাজ তাঁহার কাছে গিয়া কাতরস্বরে কহিলেন "ভাই, আমি অক্ষম—আমার উপর রাগ করা অন্যায়—তুমি যদি আজ লক্ষ্য ভেদ করিতে না পার তবে তোমার ভ্রষ্টলক্ষ্যতীর আমার হৃদয় বিদীর্ণ করিবে, ইহা নিশ্চয় জানিও।"

ইন্দ্রকুমার যুবরাজের পদধুলি লইয়া কহিলেন—"দাদা, তোমার আশীর্ব্বাদে আজ লক্ষ্য ভেদ করিব, ইহার অন্যথা হইবে না।"

ইন্দ্রকুমার তীর নিক্ষেপ করিলেন, লক্ষ্য বিদ্ধ হইল। বাজনা বাজিল। চারিদিকে জয়ধ্বনি উঠিল। যুবরাজ যখন ইন্দ্রকুমারকে আলিঙ্গন করিলেন, আনন্দে ইন্দ্রকুমারের চক্ষু ছল্ ছল্ করিয়া আসিল। ইষা খাঁ পরম স্নেহে কহিলেন—"পুত্র আল্লার কৃপায় তুমি দীর্ঘজীবী হইয়া থাক।"

মহারাজা যখন ইন্দ্রকুমারকে পুরস্কার দিবার উদ্যোগ করিতে-

ছেন এমন সময়ে রাজধর গিয়া কহিলেন—"মহারাজ আপনাদের ভ্রম হইয়াছে। আমার তীর লক্ষ্যভেদ করিয়াছে!"

মহারাজ কহিলেন—"কখনই না!"

রাজধর কহিলেন—"মহারাজ কাছে গিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখুন!

সকলে লক্ষ্যের কাছে গেলেন। দেখিলেন যে-তীর মাটিতে বিদ্ধ তাহার ফলায় ইন্দ্রকুমারের নাম খোদিত—আর যে-তীর লক্ষ্যে বিদ্ধ তাহাতে রাজধরের নাম খোদিত। রাজধর কহিলেন "বিচার করুন মহারাজ।"

ইষা খাঁ কহিলেন "নিশ্চয় তূণ বদল হইয়াছে!"

কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল তূণ বদল হয় নাই। সকলে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিলেন।

ইষা খাঁ কহিলেন "পুনর্ব্বার পরীক্ষা করা হউক!"

রাজধর বিষম অভিমান করিয়া কহিলেন—"তাহাতে আমি সম্মত হইতে পারি না! আমার প্রতি এ বড় অন্যায় অবিশ্বাস! আমি ত পুরস্কার চাই না। মধ্যমকুমার বাহাদুরকে পুরস্কার দেওয়া হউক্"—বলিয়া পুরস্কারের তলোয়ার ইন্দ্রকুমারের দিকে অগ্রসর করিয়া দিলেন।

ইন্দ্রকুমার দারুণ ঘৃণার সহিত বলিয়া উঠিলেন—"ধিক্! তোমার হাত হইতে এ পুরস্কার গ্রাহ্য করে কে! এ তুমি লও"—বলিয়া তলোয়ার খান ঝন্‌ঝন্ করিয়া রাজধরের পায়ের কাছে

ফেলিয়া দিলেন। রাজধর হাসিয়া নমস্কার করিয়া তাহা তুলিয়া লইলেন।

তখন ইন্দ্রকুমার কম্পিতস্বরে পিতাকে কহিলেন "মহারাজ, আরাকানপতির সহিত শীঘ্র যুদ্ধ হইবে। সেই যুদ্ধে গিয়া আমি পুরস্কার আনিব। মহারাজ আদেশ করুন!"

ইষা খাঁ ইন্দ্রকুমারের হাত ধরিয়া কঠোর স্বরে কহিলেন "তুমি আজ মহারাজের অপমান করিয়াছ। উঁহার তলোয়ার লইয়া ছুড়িয়া ফেলিয়াছ। ইহার সমুচিত শাস্তি আবশ্যক!"

ইন্দ্রকুমার সবলে হাত ছাড়াইয়া লইয়া কহিলেন—"বৃদ্ধ, আমাকে স্পর্শ করিও না।"

বৃদ্ধ ইষা খাঁ সহসা বিষণ্ণ হইয়া ক্ষুব্ধস্বরে কহিলেন—"পুত্র, একি পুত্র! আমার পরে এই ব্যবহার! তুমি আজ আত্মবিস্মৃত হইয়াছ বৎস!

ইন্দ্রকুমারের চোখে জল উথলিয়া উঠিল—তিনি কহিলেন "সেনাপতি সাহেব, আমাকে মাপ কর, আমি আজ যথার্থই আত্মবিস্মৃত হইয়াছি!"

যুবরাজ স্নেহের স্বরে কহিলেন "শান্ত হও ভাই—গৃহে ফিরিয়া চল!"

ইন্দ্রকুমার পিতার পদধুলি লইয়া কহিলেন, "পিতা অপরাধ মার্জ্জনা করুন!" গৃহে ফিরিবার সময় যুবরাজকে কহিলেন "দাদা আজ আমার যথার্থই পরাজয় হইয়াছে!"

রাজধর যে কেমন করিয়া জিতিলেন তাহা কেহ বুঝিতে পারিল না। ক্রমশঃ।

কাজের লোক কে?

আজ প্রায় চার শত বৎসর হইল পঞ্জাবে তলবন্দী গ্রামে কালু বলিয়া একজন ক্ষত্রিয় ব্যবসা বাণিজ্য করিয়া খাইত। তাহার এক ছেলে নানক। নানক কিন্তু নিতান্ত ছেলে-মানুষ নহে। তাহার বয়স হইয়াছে, এখন কোথায় সে বাপের ব্যবসা বাণিজ্যে সাহায্য করিবে তাহা নহে—সে আপনার ভাবনা লইয়া দিন কাটায়—সে ধর্ম্মের কথা লইয়াই থাকে।

কিন্তু বাপের মন টাকার দিকে,ছেলের মন ধর্ম্মের দিকে—সুতরাং বাপের বিশ্বাস হইল এ ছেলেটার দ্বারা পৃথিবীর কোন কাজ হইবে না! ছেলের দুর্দ্দশার কথা ভাবিয়া কালুর রাত্রে ঘুম হইত না। নানকেরও যে রাত্রে ভাল ঘুম হইত তাহা নহে, তাহারও দিনরাত্রি একটা ভাবনা লাগিয়াছিল।

বাবা যদিও বলিতেন ছেলের কিছু হইবে না কিন্তু পাড়ার লোকেরা তাহা বলিত না। তাহার একটা কারণ বোধ করি এই হইবে যে, নানকের ধর্ম্মে মন থাকাতে পাড়ার লোকের বাণিজ্য-ব্যবসার বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। কিন্তু বোধ করি তাহারা নানকের চেহারা নানকের ভাব দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছিল। এমন কি

নানকের নামে একটা গল্প রাষ্ট্র আছে। গল্পটা যে সত্য নয় সে আর কাহাকেও বলিতে হইবে না। তবে, লোকে যেরূপ বলে তাহাই লিখিতেছি। একদিন নানক মাঠে গরু চরাইতে গিয়া গাছের তলায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। সূর্য্য অস্ত যাইবার সময় নানকের মুখে রোদ লাগিতেছিল। শুনা যায় না কি একটা কালো সাপ নানকের মুখের উপর ফণা ধরিয়া রোদ আড়াল করিয়াছিল। সে দেশের রাজা সে সময়ে পথ দিয়া যাইতেছিলেন—তিনি নাকি স্বচক্ষে এই ঘটনা দেখিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা রাজার নিজের মুখে এ কথা শুনি নাই—নানকও কখন এ গল্প করেন নাই—এবং এমন পরোপকারী সাপের কথাও কখন শুনি নাই—শুনিলেও বড় বিশ্বাস হয় না।

কালু অনেক ভাবিয়া স্থির করিলেন নানক যদি নিজের হাতে ব্যবসা আরম্ভ করেন তবে ক্রমে কাজের লোক হইয়া উঠিতে পারেন। এই ভাবিয়া তিনি নানকের হাতে কিছু টাকা দিলেন—বলিয়া দিলেন "এক গাঁয় লুন কিনিয়া আর এক গাঁয়ে বিক্রয় করিয়া আইস।" নানক টাকা লইয়া বালসিন্ধু চাকরকে সঙ্গে করিয়া লুন কিনিতে গেলেন। এমন সময়ে পথের মধ্যে কতকগুলি ফকিরের সঙ্গে নানকের দেখা হইল। নানকের মনে বড় আনন্দ হইল। তিনি ভাবিলেন এই ফকিরদের কাছে ধর্ম্মের বিষয় জানিয়া লইবেন। কিন্তু কাছে গিয়া যখন তাহাদিগকে কথা জিজ্ঞাসা করিলেন তখন তাহারা কথার

উত্তর দিতে পারে না। তিনদিন তাহারা খাইতে পায় নাই—এমনি দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছে যে মুখ দিয়া কথা সরে না। নানকের মনে বড় দয়া হইল। তিনি কাতর হইয়া তাঁহার চাকরকে বলিলেন "আমার বাপ কিছু লাভের জন্য আমাকে নুনের ব্যবসা করিতে হুকুম করিয়াছেন ; কিন্তু এ লাভের টাকা কতদিনই বা থাকিবে! দুই দিনেই ফুরাইয়া যাইবে। আমার বড় ইচ্ছা হইতেছে এই টাকায় এই গরিবদের দুঃখ মোচন করিয়া, যে লাভ চিরদিন থাকিবে সেই পুণ্য লাভ করি।" বালসিন্ধু কাজের লোক ছিলেন বটে কিন্তু নানকের কথা শুনিয়া তাহার মন গলিয়া গেল। সে কহিল "এ বড় ভাল কথা।" নানক তাঁহার ব্যবসার সমস্ত টাকা ফকিরদের দান করিলেন। তাহারা পেট ভরিয়া খাইয়া যখন গায়ে জোর পাইল, তখন নানককে ডাকিয়া ঈশ্বরের কথা শুনাইল। তাহারা নানককে বুঝাইয়া দিল—ঈশ্বর কেবল একমাত্র আছেন আর সমস্ত তাঁহারই সৃষ্টি। এ সকল কথা শুনিয়া নানকের মনে বড় আনন্দ হইল।

তাহার পরদিন নানক বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন। কালু জিজ্ঞাসা করিলেন "কত লাভ করিলে?" নানক বলিলেন "বাবা, আমি গরিবদের খাওয়াইয়াছি। তোমার এমন ধনলাভ হইয়াছে যাহা চিরদিন থাকিবে!" কিন্তু সেরূপ ধনের প্রতি কালুর বড় একটা লোভ ছিল না। সুতরাং তিনি রাগিয়া ছেলেকে মারিতে লাগিলেন। এমন সময়ে সে-প্রদেশের ক্ষুদ্র রাজা, পথ দিয়া যাইতেছিলেন। তাঁহার নাম রায়-

বোলার। নানককে মারিতে দেখিয়া তিনি ঘরে প্রবেশ করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হইয়াছে? এত গোল কেন?" যখন সমস্ত ব্যাপার শুনিলেন তখন তিনি কালুকে খুব করিয়া তিরস্কার করিলেন। বলিলেন আর যদি কখন নানকের গায়ে হাত তোল ত দেখিতে পাইবে।" এমন কি রাজা অত্যন্ত ভক্তির সহিত নানককে প্রণাম করিলেন। লোকে বলে যে, যখন সাপ নানককে ছাতা ধরিয়াছিল তখন রাজা তাহা দেখিয়াছিলেন; এই জন্যই নানকের উপর তাঁহার এত ভক্তি হইয়াছিল। কিন্তু সে সাপের ছাতা ধরা সমস্তই গুজব—আসল কথা নানকের সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া রাজা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, নানক একজন মস্তলোক। নানকের উপর আর ত মারধোর চলে না। কালু অন্য উপায় দেখিতে লাগিলেন।

জয়রাম নানকের ভগ্নীপতি। পাঠান দৌলৎ খাঁর শস্যের গোলা জয়রামের জিম্মায় ছিল। কালু স্থির করিলেন নানককেও জয়রামের কাজে লাগাইয়া দিবেন—তাহা হইলে ক্রমে নানক কাজের লোক হইয়া উঠিবেন। নানকের বাপ যখন নানকের কাছে এই প্রস্তাব করিলেন, তখন তিনি বলিলেন "আচ্ছা।" এই বলিয়া নানক সুল-তানপুরে জয়রামের কাছে গিয়া উপস্থিত। সেখানে দিনকতক বেশ কাজ করিতে লাগিলেন। সকলের পরেই তাঁহার ভালবাসা ছিল, এইজন্য সুলতানপুরের সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিতে লাগিল। কিন্তু

কাজে মন দিয়া নানক তাঁহার আসল কাজটা ভুলেন নাই। তিনি ঈশ্বরের কথা সর্ব্বদাই ভাবিতেন।

এমন কিছুকাল কাটিয়া গেল। একদিন সকালে নানক একলা বসিয়া ঈশ্বরের ধ্যান করিতেছেন, এমন সময়ে একজন মুসলমান ফকির আসিয়া তাঁহাকে বলিল—"নানক, তুমি আজকাল কি লইয়া আছ বল দেখি? এই সকল কাজকর্ম্ম ছাড়িয়া দাও। চিরদিনের যে যথার্থ ধন তাহাই উপার্জ্জনের চেষ্টা কর।"—ফকির যাহা বলিলেন তাহার অর্থ এই যে, ধর্ম্ম উপার্জ্জন কর—পরের উপকার কর—পৃথিবীর ভাল কর—ঈশ্বরে মন দাও—টাকা রোজকার করিয়া পেট ভরিয়া খাওয়ার চেয়ে ইহাতে বেশী কাজ দেখে।

ফকিরের এই কথাটা হঠাৎ এমনি নানকের মনে লাগিল যে, তিনি চমকিয়া উঠিলেন, ফকিরের মুখের দিকে একবার চাহিয়া দেখিলেন ও মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মূর্চ্ছা ভাঙ্গিতেই তিনি গরীব লোকদিগকে ডাকিলেন ও শস্য যাহা কিছু ছিল সমস্ত তাহাদিগকে বিলাইয়া দিলেন। নানক আর ঘরে থাকিতে পারিলেন না। কাজকর্ম্ম সমস্ত ছাড়িয়া দিয়া তিনি পলাইয়া গেলেন।

নানক পালাইলেন বটে কিন্তু অনেক লোক তাঁহার সঙ্গ লইল। যাঁহার ধর্ম্মের দিকে এত টান, এমন মধুর ভাব, এমন মহৎ স্বভাব, তিনি সকলকে ছাড়িলেও তাঁহাকে সকলে ছাড়ে না। মর্দ্দানা তাঁহার সঙ্গে গেল, সে ব্যক্তি বীণা বাজাইত, গান গাহিত। লেনা তাঁহার সঙ্গে

গেল। সেই যে পুরানো চাকর বাল্যসিন্ধু ছেলেবেলায় নানকের সঙ্গে লুন বিক্রয় করিয়া টাকা লাভ করিতে গিয়াছিল আজও সে নানকের সঙ্গে চলিল। এবারেও বোধ করি কিঞ্চিৎ ধনলাভের আশা ছিল, কিন্তু সে-সে ধন নয়, সকল ধনের শ্রেষ্ঠ যে ধন সেই ধর্ম্ম। রামদাসও নানককে ছাড়িতে পারিল না—তাহার বয়স বেশী হইয়াছিল বলিয়া সকলে তাহাকে বলিত বুড্‌ঢা। আর কত নাম করিব, এমন ঢের লোক সঙ্গে গেল।

নানক যথাসাধ্য সকলের উপকার করিয়া সকলকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া দেশে দেশে বেড়াইতে লাগিলেন। হিন্দু মুসলমান সকলকেই তিনি ভালবাসিতেন। হিন্দুধর্ম্মের যাহা দোষ ছিল তাহাও তিনি বলিতেন, মুসলমান ধর্ম্মের যাহা দোষ ছিল তাহাও তিনি বলিতেন। অথচ হিন্দু মুসলমান সকলেই তাঁহাকে ভক্তি করিত। নানক আমাদের বাঙ্গালা দেশেও আসিয়াছিলেন। শিবনাভ বলিয়া কোন্ এক দেশের রাজা নানা লোভ দেখাইয়া নানককে উচ্ছন্ন দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু নানক তাহাতে ভুলিবেন কেন? উল্টিয়া রাজাকে তিনি ধর্ম্মের দিকে লওয়াইলেন। মোগল-সম্রাট বাবরের সঙ্গে একবার নানকের দেখা হয়। সম্রাট নানকের সাধুভাব দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিস্তর টাকা পুরস্কার দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু নানক তাহা লইলেন না—তিনি বলিলেন "যে জগদীশ্বর সকল লোককে অন্ন দিতেছেন, অনুগ্রহ ও পুরস্কার আমি তাঁহারই কাছ

হইতে চাই আর কাহারো কাছে চাই না।" নানক যখন মক্কায় বেড়াইতে গিয়াছিলেন তখন একদিন তিনি মস্‌জিদের দিকে পা করিয়া ঘুমাইতেছিলেন। তাহা দেখিয়া একজন মুসলমানের বড় রাগ হইল। সে তাঁহাকে জাগাইয়া বলিল—"তুমি কেমন লোক হে! ঈশ্বরের মন্দিরের দিকে পা করিয়া তুমি ঘুমাইতেছ!" নানক বলিলেন, "আচ্ছা, ভাই, জগতের কোন্‌দিকে ঈশ্বরের মন্দির নাই একবার দেখাইয়া দাও!" নানক লোক ভুলাইবার জন্য কোন আশ্চর্য্য কৌশল দেখাইয়া কখনো আপনাকে মস্তলোক বলিয়া প্রচার করিতে চাহেন নাই। গল্প আছে একবার কেহ কেহ তাঁহাকে বলিয়াছিল—"আচ্ছা, তুমি যে একজন মস্ত সাধু—আমাদিগকে একটা কোন আশ্চর্য্য অলৌকিক ঘটনা দেখাও দেখি!" নানক বলিলেন "তোমাদিগকে দেখাইবার যোগ্য আমি কিছুই জানি না। আমি কেবল পবিত্র ধর্ম্মের কথা জানি, আর কিছুই জানি না। ঈশ্বর সত্য, আর সমস্ত অস্থায়ী।"

নানক অনেক দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়া গৃহস্থ হইলেন। গৃহে থাকিয়া তিনি সকলকে ধর্ম্মোপদেশ দিতেন। তিনি কোরাণ পুরাণ কিছুই মানিতেন না। তিনি সকলকে ডাকিয়া বলিতেন এক ঈশ্বরকে পূজা কর, ধর্ম্মে মন দাও, অন্য সকলের দোষ মার্জ্জনা কর,সকলকে ভালবাস। এইরূপে সমস্ত জীবন ধর্ম্মপথে থাকিয়া সকলকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া সত্তর বৎসর বয়সে নানকের মৃত্যু হয়।

কাজের লোক কে।

কালু বেশী কাজের লোক ছিলেন কি কালুর ছেলে নানক বেশী কাজের লোক ছিলেন আজ তাহা হিসাব করিয়া দেখিব! আজ যে শিখজাতি দেখিতেছ, যাহাদের সুন্দর আকৃতি, মহৎ মুখশ্রী, বিপুল বল, অসীম সাহস দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ হয়, এই শিখজাতি নানকের শিষ্য। নানকের পূর্ব্বে এই শিখজাতি ছিল না। নানকের মহৎ প্রাণ ও ধর্ম্মবল পাইয়া এমন একটী মহৎ জাতি উৎপন্ন হইয়াছে। নানকের ধর্ম্মশিক্ষার প্রভাবেই ইহাদের হৃদয়ের তেজ বাড়িয়াছে, ইহাদের শির উন্নত হইয়াছে, ইহাদের চরিত্রে ও ইহাদের মুখে মহৎ ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। কালু যে টাকা রোজগার করিয়াছিলেন, নিজের উদরেই তাহা খরচ করিয়াছেন, আর নানক যে ধর্ম্মধন উপার্জ্জন করিয়াছিলেন আজ চার-শ বৎসর ধরিয়া মানবেরা তাহা ভোগ করিতেছে! কে বেশী কাজ করিয়াছেন!

সূর্য্যের কথা।

সূর্য্যের সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে গেলে পাঠকেরা বোধ করি রাগ করিবেন। তাঁহারা বলিবেন আমরা কি জানি না যে সূর্য্য পৃথিবী হইতে অনেক দূরে, সূর্য্য পৃথিবী হইতে অনেক বড় ইত্যাদি? কিন্তু পাঠকেরা প্রথমেই না চটিয়া একটু ধৈর্য্য ধরিয়া পড়িয়া দেখিবেন, সব কথা নিতান্ত পুরাতন ঠেকিবেনা।

সকলেই জানেন বটে যে, সূর্য্য পৃথিবী হইতে চার কোটি পঞ্চাশ লক্ষ ক্রোশের চেয়েও বেশী দূরে আছে। কিন্তু সে কেবল জানাই সার। এক শ দুই শ ক্রোশ যে কত খানি তাহাই আমাদের মনে ভাল আয়ত্ত হয় না ত চার কোটি ক্রোশ! এখান হইতে সূর্য্যে পৌঁছিতে কতক্ষণ লাগে তাহার একটা উদাহরণ দিলে তবু কতকটা বুঝা যায়। মনে কর, যে রেলগাড়ি ঘণ্টাপিছু ৩০ ক্রোশ করিয়া চলে অর্থাৎ দুই মিনিটে এক ক্রোশ যায় এইরূপ গাড়িতে চড়িয়া তুমি যদি ১৭১ বৎসর আগে পৃথিবী হইতে যাত্রা করিতে তবে আজ তুমি সূর্য্যের নিকট যাইতে পারিতে। মোগল রাজত্বের সম আরঙ্গীবের প্রপৌত্র ফেরোক্‌সের যখন সবে দিল্লীর রাজা হইয়াছেন তখন যদি রেল গাড়িতে চড়িতে তবে লর্ড ডফরিন্‌ যেই ভারত-

বর্ষে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন তুমিও দিন রাত্রি ছুটিয়া সূর্য্যের কাছাকাছি ষ্টেশনে পৌঁছিয়াছ। ইতিমধ্যে ক্রমান্বয়ে মহম্মদ সা, আমেদ সা, দ্বিতীয় আলমগীর দিল্লীর বাদসা হইলেন। মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রতাপ বাড়িল। মহারাষ্ট্রীদের সঙ্গে ইংরেজের যুদ্ধ হইল। ভারতবর্ষে কোম্পানির মুল্লুক ব্যাপ্ত হইল। ভারতবর্ষ কোম্পানির হাত হইতে রাণীর হাতে আসিল। অনেক লাটসাহেবের পর লর্ড রিপণ আসিলেন। তিনি চলিয়া গেলেন লর্ড ডফরিন্ আসিলেন।

সূর্য্যের কাছে গেলে তাহাকে কতবড় দেখিতে? আনাক্সাগোরস নামক গ্রীসদেশের একজন পণ্ডিত পিলাপনিসস্ প্রদেশ অপেক্ষা

সূর্য্যকে বৃহৎ বলায় গ্রীকদেশের লোকেরা তাঁহাকে উপহাস করিয়াছিল। পিলপনিসস্ গ্রীস দেশের একটি অংশ। কিন্তু তাহারা যদি শুনিত যে সূর্য্য সমস্ত গ্রীসদেশ অপেক্ষা কেন, পৃথিবী অপেক্ষা দশলক্ষ গুণ বড় তাহা হইলে তাহারা না জানি কি বলিত! পৃথিবী এত বড় যে আমাদের বাঙ্গালা দেশ তাহার উপরে ক্ষুদ্র বিন্দুর মত। একটা দ্রুতগামী রেলগাড়িতে উঠিলে পৃথিবীর চারিধারে ঘুরিতে এক-মাস কাল লাগে। আমাদের দেশ পৃথিবীর নিকট এক বিন্দুর ন্যায় কিন্তু সূর্য্যের নিকট পৃথিবীর আয়তন কিছুই নহে। কারণ পৃথিবীর ব্যাস চারি হাজার (৪০০০) ক্রোশ। এবং সূর্য্যের ব্যাস ৪ লক্ষ ছাব্বিশ হাজার ক্রোশ। সূর্য্যকে এবং পৃথিবীকে যদি তরমুজের মত মাঝামাঝি দুইখানি করিয়া কাটা যায় ও পৃথিবীর কাটা দিক্‌টা সূর্য্যের কাটা দিকের উপর রাখা যায়, তাহা হইলে এমন ১০৬ খানা পৃথিবী সার বাঁধিয়া রাখিলে তবে সূর্য্যের ব্যাসরেখা পূর্ণ হয়। ছবিতে ঐ যে সূর্য্যের পেটের উপরে পুঁথির মালার মত আঁকা আছে,উহার এককটা পুঁথি অর্থাৎ এককটি বিন্দু এককটি পৃথিবী। ঐ মালায় ১০৬টি পৃথিবী আছে। সূর্য্যের সমস্ত আয়তন কত বড় যদি জানিতে চাও তাহা হইলে তাহাকে একটা ফাঁপা গোলার মত মনে কর এবং তারপর দেখ কতগুলি পৃথিবী হইলে তাহার পেট ভরে। দেশলক্ষ একত্রিশ হাজারটা পৃথিবী ইহার মধ্যে অক্লেশে ধরিতে পারে। আমাদের পেটে এতগুলা তিল ধরে কি না সন্দেহ।

সূর্য্য যে কত বড় তাহা বুঝিলাম। কিন্তু ইহার আলোক ও উত্তাপের পরিমাণ যে কত তাহা মনে ধারণা করা এক প্রকার অসম্ভব। এক টুকরা চা-খড়ির চারিধারে অম্লজান এবং জলজানের আলো জ্বালাইলে সেই খড়ি অত্যন্ত উত্তপ্ত হইয়া এক প্রকার কৃত্রিম আলো প্রদান করে। তাহা এত প্রখর যে তাহার দিকে চক্ষু রাখা যায় না। ইহার আলোক সূর্য্যকিরণের মত অতি শুভ্র। তাই বলে কি তুমি মনে কর যে সূর্য্যের মত বড় একটা চা-খড়ি আনিয়া তাহাকে অম্লজান ও জলজান বাষ্প দিয়া জ্বালাইলেই সূর্য্যের সমান আলোক ও উত্তাপ পাওয়া যাইবে? তাহা নহে, সূর্য্য অপেক্ষা ১৪৬ গুণ বড় অর্থাৎ পৃথিবী অপেক্ষা চৌদ্দকোটি গুণ বড় একখানা চা-খড়ি আনিতে হইবে, তবে একটা কৃত্রিম সূর্য্য নির্ম্মাণ করিতে পারা যায়। মনে করিয়া দেখ সূর্য্যের সমস্ত কিরণের মধ্যে কত অল্প টুকুই আমাদের এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর উপর পড়িতেছে, অথচ বৈশাখ মাসে ইহাই আমাদের কাছে কি প্রখর বোধ হয়! ঘরের মধ্যে যে প্রদীপ জ্বলিতেছে তাহার আলোক চারি ধারে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ক্ষুদ্র এক সরিষা আনিয়া প্রদীপের কিছু দূরে ধরিলে কতটুকু আলো সেই সরিষার উপরে পড়ে! তুলনা করিলে আমাদের পৃথিবীর উপরেও ততটুকুই সূর্য্যের আলো পড়ে এবং তাহাতেই পৃথিবীর সমস্ত কার্য্য চলিয়া যায়। সূর্য্য-কিরণের প্রখরতা যদি পরীক্ষা করিতে চাও তাহা হইলে আতুষি কাচের সাহায্যে সহজে করিতে পার আতুষি

কাচ সূর্য্যের সম্মুখে ধরিলে তাহার কিরণ সেই কাচের মধ্য দিয়ে বিন্দু আকারে মিলিত হয়, এবং তাহাতে কাগজ জ্বলিয়া উঠে। সার জন হর্শেল বলেন যে, আফ্রিকার দক্ষিণে উত্তমাশা অন্তরীপে সূর্য্যের উত্তাপ এত অধিক যে তিনি একটী কাচের বাক্সে মাংস ও ডিম্ব রাখিয়া কেবলমাত্র রৌদ্রের সাহায্যে তাহা পাক করিয়াছিলেন। তবু সূর্য্যকিরণের সমস্ত দৌরাত্ম্য আমাদিগকে সহিতে হয় না। সূর্য্যের উত্তাপে জলের কণা বাতাসে ছড়াইয়া পড়ে, তাহাতে করিয়া বাতাস অনেকটা ঠাণ্ডা রাখে, তাহা না হইলে সূর্য্যকিরণের জ্বালায় পৃথিবীতে আমাদের টেকা দায় হইত।

———

সাহসের পুরস্কার।

নেপোলিয়ান বোনাপার্টির নাম তোমরা সকলেই শুনিয়াছ। তিনি একসময়ে ইংরাজের দেশ আক্রমণ করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। যখন যুদ্ধের উদ্যোগ চলিতেছে তখন কি গতিকে একজন ইংরাজী জাহাজের গোরা ফরাসী সৈন্যদের কাছে ধরা পড়ে। শত্রুপক্ষের লোক দেখিয়া ফরাসীরা তাহাকে নিজের দেশে ধরিয়া আনিয়া সমুদ্রের ধারে ছাড়িয়া দেয়। সে বেচারা একা একা সমুদ্রের ধারে ঘুরিয়া বেড়াইত। দেশে ফিরিবার জন্য তাহার প্রাণ কাঁদিত। সমুদ্রের পর পারেই তার স্বদেশ। সে সমুদ্রও কিছু বেশী বড় নয়। এমন কি এক এক দিন হয়ত মেঘ কাটিয়া গেলে রোদ উঠিলে ইংলণ্ডের সাদা সাদা পাহাড়ের রেখা নীল-সমুদ্রের উপর মেঘের মত দেখা যাইত। সে আকাশে চাহিয়া দেখিত, গর্ম্মির দিনে কত ছোট ছোট পাখী পাখা তুলিয়া ইংলণ্ডের দিকে উড়িয়া যাইতেছে।

একদিন রাত্রে ঝড় হইয়া গেলে পর সকালে উঠিয়া দেখে একটি পিপে সমুদ্রের ঢেউয়ে ডাঙ্গার দিকে ভাসিয়া আসিতেছে। সেই পিপেটি লইয়া সে একটি পাহাড়ের গর্ত্তের মধ্যে লুকাইয়া রাখিল। সমস্ত দিন ধরিয়া বসিয়া বসিয়া সেই পিপেটি ভাঙ্গিয়া সে নৌকা

বানাইত। কিন্তু সে গরীব—নৌকা বানাইবার সরঞ্জাম কোথায় পাইবে! সে সেই ভাঙ্গা পিপের কাঠের চারিদিকে নরম গাছের ডাল বুনিয়া এক প্রকার নৌকার মত গড়িয়া তুলিল। দেশের জন্য এমনি তাহার প্রাণ আকুল হইয়াছে যে সে একবার বিবেচনা করিল না যে এ নৌকা সমুদ্রের জলে একদণ্ড টিকিতে পারিবে না। যাহা হউক সেই নোকাটি লইয়া যখন সে সমুদ্রে ভাসাইতেছে, এমন সময় ফরাসী সৈন্যেরা তাহাকে দেখিতে পাইল। ফরাসীরা তাহাকে ধরিল। বেচারার এত কষ্টের নৌকা ভাসমান হইল না—এত দিনের আশা নির্ম্মূল হইল।

এই কথা কি করিয়া নেপোলিয়নের কাণে উঠিল। নেপোলিয়ন সমুদ্রের ধারে গিয়া সমস্ত দেখিলেন। তিনি সেই ইংরাজ-বালককে বলিলেন—"তোমার এ কি রকম সাহস! এই খানকতক কাঠ আর গাছের ডাল বেঁধে তুমি সমুদ্র পার হতে চাও! দেশে তোমার কেইবা আছে!"

সেই ইংরাজ বলিল—"আমার মা আছে! আমার মাকে অনেক দিন দেখি নাই, মাকে দেখিবার জন্য প্রাণ বড় আকুল হইয়াছে।" বলিতে বলিতে তাহার চোখ ছলছল করিয়া আসিল।

নেপোলিয়ন তৎক্ষণাৎ বলিলেন—"আচ্ছা মায়ের সঙ্গে তোমার

দেখা হবে, আমি দেখা করিয়ে দেব। যে ছেলে এমন সাহসী তাহার মা না-জানি কত মহৎ!"

নেপোলিয়ন তাহাকে একটি মোহর দিলেন—এবং নিজের জাহাজে করিয়া তাহাকে ইংলণ্ডে পাঠাইয়া দিলেন। দুঃখে পড়িলেও সেই মোহরটি সে কখনও ভাঙ্গায় নাই, নেপোলিয়নের দয়া মনে রাখিবার জন্য সেই মোহরটি সে চিরদিন কাছে রাখিয়াছিল।

দার্জ্জিলিং-যাত্রা।

যখন তিনটার সময় শেয়ালদহে দার্জ্জিলিংএর গাড়ীতে উঠিলাম তখন আমার মনে বড় আনন্দের উদয় হইল। উঁচু জায়গার মধ্যে মাণিক-তলার খাল কাটার সময়ে মাটি জমা হইয়াছিল তাহাই দেখিয়াছি, আর অত্যন্ত মোটা রামশঙ্কর কামারকে পাড়ার লোকেরা পর্ব্বত বলিয়া থাকে, তাহাকেও দেখিয়াছি—ইহা হইতে হিমালয়ের ভাব যতটা পাওয়া যায় তাহা পাওয়া গিয়াছে—কিন্তু এবার স্বয়ং হিমালয়ে সশরীরে যাইতেছি, হিমালয় পর্ব্বত সশরীরে স্বচক্ষে দেখিব, একথা যতই মনে হইতে লাগিল, আনন্দে আমার বক্ষঃস্থল হিমালয় অপেক্ষা ফুলিয়া উঠিতে লাগিল।

সন্ধ্যা ৭ টার সময় দামুকদিয়া ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। দার্জ্জিলিং যাত্রীদের এই ষ্টেশনে নামিতে হয় এবং পদ্মানদী পার হইয়া অন্য এক ট্রেণে চড়িতে হয়। আমরা যখন এখানে আসিয়া পৌঁছিলাম তখন মুষলধারে বৃষ্টি হইতেছে। জাহাজে উঠিলাম। নদী পার হইতে পনের মিনিটের কিছু বেশী লাগে। পার হইয়া দেখি যে সারাঘাট ষ্টেশনে অন্য এক ট্রেণ প্রস্তুত আছে। তাহাতে উঠিয়া পড়িলাম। এখানকার গাড়ীগুলি ছোট ছোট। ট্রেণের ঝাঁকানীতে

আমার নিদ্রা বেশ হয়, সুতরাং রাত্রিটি বেশ কাটিয়া গেল। ভোর ৬ টার কিছু পূর্ব্বে ষ্টেশনে গাড়ি থামিল।—আমরা চা পান করিয়া লইলাম। এক ঘন্টা পরে শিলিগুড়ি ষ্টেশনে গাড়ী থামিল। এই স্থান হইতে কলের ট্রাম গাড়ীতে চড়িয়া পাহাড়ে উঠিতে হয়। এস্থানে দিব্য আহারের স্থান আছে। ট্রামগাড়ী প্রস্তুত আছে তাহাতে চড়িলাম। এস্থানের ট্রাম গাড়ীগুলি নূতন ধরণের, খান আঠার গাড়ীর মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীগুলি চতুর্দ্দিকে শাসি দ্বারা ঢাকা, বাকিগুলি কতকটা চিৎপুর-রোডের ট্রাম গাড়ীর মত ফাঁকা। এই ফাঁকা গাড়ীতে চড়িলে চারিদিকের দৃশ্য বেশ ভাল দেখা যায়, সুতরাং আমরা তাহাতেই বসিলাম। শিলিগুড়িতে পৌঁছিয়া যাত্রীদের গরম কাপড় পরিতে হয়। আমি কাপড় ছাড়িলাম। ট্রামগাড়ী ছাড়িল। চারিদিকে ধানের ক্ষেত্র, মধ্যে মধ্যে চা-ক্ষেত্রের সুন্দর শোভা দেখিতে দেখিতে গাড়ী পাহাড়ের নীচে আসিল। এইবার পাহাড়ের উপরে উঠিতে আরম্ভ করা গেল। ঘন এক শালবনের মধ্যদিয়া গাড়ী চলিয়াছে, চারিদিকে বড় বড় শালগাছ ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না। কতক্ষণ পরে গাড়ী ঘুরিয়া এক ফাঁকা জায়গায় আসিল, তখন নীচের দিকে চাহিয়া দেখি আমরা পাহাড়ের উপরে। কখন দক্ষিণে প্রকাণ্ড পাহাড়, বামে খদ্, কখনো বা দক্ষিণে খদ্ ও বামে পাহাড়। ট্রামের রাস্তা মস্ত সাপের মত পাহাড়কে ঘিরিয়া অল্প অল্প উচ্চ হইয়া উপরে

উঠিয়াছে। এইরূপ, ঘুরিতে ঘুরিতে চলিলাম। মাঝে মাঝে ষ্টেশন আছে। প্রথম ষ্টেশন "তিন-দরিয়া" শিলিগুড়ি হইতে নয়ক্রোশ, এখানে ট্রেণ পনের মিনিট থাকে। তিন-দরিয়া হইতে যখন গাড়ী ছাড়িল, তখন চতুর্দ্দিকে মেঘ, ঘন কোয়াসার মত সাদা হইয়া চারিদিক ঘিরিয়া রহিয়াছে। মেঘের ভিতর দিয়া গাড়ী চলিতে লাগিল। আশে পাশের ঘর বাড়ী ছাড়া দূরের কিছুই দেখা যায় না, সমস্ত মেঘে ঢাকা। এক ক্রোশ উপরে যখন গাড়ী উঠিল, তখন ঝম্ ঝম্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। বৃষ্টি হইতেছে, মেঘ ঈষৎ কাটিয়া আসিতেছে, নীচের পাহাড়ে চাহিয়া দেখি সেখানে দিব্য রৌদ্র ফুট ফুট করিতেছে। এইরূপ আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখিতে দেখিতে মনে হইল পৃথিবী ছাড়িয়া উপরে স্বর্গের পথে যাইতেছি। প্রায় কুড়ি মিনিট পরে "গয়াবাড়ি" ষ্টেশনে পৌছিলাম। এখান হইতে গাড়ি ছাড়িলে নীচের পাহাড়ে কতকগুলি চা-ক্ষেত্র দেখা যায়। দূর হইতে চা-ক্ষেত্রগুলি অতি সুন্দর দেখায়, মনে হয় কে যেন পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট সবুজ ফোঁটা পরাইয়া দিয়াছে। তারপর আমরা কার্সিয়ং ষ্টেশনে পৌছিলাম। পূর্ব্বে এ একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ে পল্লী ছিল মাত্র, কিন্তু ক্রমে পাহাড়ের সমস্ত ষ্টেশনের মধ্যে একটি প্রধান সহর হইয়া দাঁড়াইতেছে। কার্সিয়ং ৪৫০০ ফিট্ উচ্চ। যখন এখানে পৌছিলাম তখন আমি শীতে কাঁপিতেছি।

এর পর "সোণাদহ" ষ্টেশন, একটি ক্ষুদ্র পল্লী কতকগুলি

অপরিষ্কার বাজার দেখা যায় মাত্র। এখান হইতে ছাড়িয়া "ঘুম" ষ্টেশনে পৌঁছান গেল। অনেকে বলেন যে পৃথিবীর কোন পাহাড়ের উপর এত উচ্চ রেলগাড়ি যায় নাই। ইহা ৭৪০০ ফিট উচ্চ। দার্জ্জিলিং এই স্থান হইতে দুই ক্রোশ নীচে, সুতরাং গাড়ি নীচে নামিতে আরম্ভ করিল। নামিবার সময় দক্ষিণ দিকে "জলা পাহাড়ের" উপরে সৈন্যদের বারিক অল্প অল্প দেখিতে পাওয়া যায়, এবং বামে অনেক দূরে "টঙ্গলুপর্ব্বত" ও হিমালয়ের শৃঙ্গ "সিঙ্গলীলা" এবং নিকটে সারি সারি অনেক চা-ক্ষেত্র দেখা যায়। এক ক্রোশ নীচে যখন গাড়ি নামিল, তখন দূর হইতে দার্জ্জিলিঙ্গের ছোট ছোট সাদা সাদা বাড়িগুলি পাহাড়ের গায়ে ছবির মত বোধ হইতে লাগিল। এইরূপে মেঘ, বৃষ্টি, রৌদ্রের মধ্য দিয়া পাহাড়, নদী, নির্ঝর এবং নানা প্রকার মনোহর দৃশ্য দেখিতে দেখিতে দার্জ্জিলিঙে আসিয়া পৌঁছিলাম। সিলিগুড়ি হইতে দার্জ্জিলিং ২৪ ক্রোশ এবং সেখান হইতে দার্জ্জিলিং পৌঁছিতে ছয় ঘণ্টা লাগে। এই ছয়ঘণ্টা যে কি সুন্দররূপে অতিবাহিত হয় তাহা লিখিয়া বর্ণনা করিতে আমি একেবারে অক্ষম। বেলা দশটার সময় সিলিগুড়ি ছাড়িয়া বৈকাল চারিটার সময় দার্জ্জিলিং পৌঁছিলাম।

বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বাণ।

দিনের আলো নিবে এল,
সূর্যি ডোবে ডোবে
আকাশ ঘিরে মেঘ জুটেছে
চাঁদের লোভে লোভে।
মেঘের উপর মেঘ করেছে,
রঙের উপর রঙ।
মন্দিরেতে কাঁসর ঘণ্টা
বাজ্‌ল ঠং ঠং।
ও-পারেতে বিষ্টি এল
ঝাপ্‌সা গাছ পালা।
এ-পারেতে মেঘের মাথায়
একশো মাণিক জ্বালা।
বাদ্‌লা হাওয়ায় মনে পড়ে
ছেলেবেলার গান—
"বিষ্টি পড়ে টাপুর্ টুপুর্
নদী এল বাণ।"

নদী এল বাণ।

আকাশ জুড়ে মেঘের খেলা
কোথায় বা সীমানা!
দেশে দেশে খেলে বেড়ায়
কেউ করে না মানা!
কত নতুন ফুলের বনে
বিষ্টি দিয়ে যায়!
পলে পলে নতুন খেলা
কোথায় ভেবে পায়!
মেঘের খেলা দেখে কত
খেলা পড়ে মনে!
কতদিনের লুকোচুরী
কত ঘরের কোণে!
তারি সঙ্গে মনে পড়ে
ছেলেবেলার গান—
"বিষ্টি পড়ে টাপুর্ টুপুর্
নদী এল বাণ।"
মনে পড়ে ঘরটি আলো
মায়ের হাসিমুখ,
মনে পড়ে মেঘের ডাকে
গুরু গুরু বুক।

বিছানাটির একটি পাশে
ঘুমিয়ে আছে খোকা,
মায়ের পরে দৌরাত্মি, সে
না যায় লেখা জোকা!
ঘরেতে দুরন্ত ছেলে
করে দাপাদাপি,
বাইরেতে মেঘ ডেকে ওঠে
সৃষ্টি ওঠে কাঁপি।
মনে পড়ে মায়ের মুখে
শুনেছিলাম গান—
"বিষ্টি পড়ে টাপুর্ টুপুর্
নদী এল বাণ।"
মনে পড়ে সুয়োরাণী
দুয়োরাণীর কথা,
মনে পড়ে অভিমানী
কঙ্কাবতীর ব্যথা।
মনে পড়ে ঘরের কোণে
মিটি মিটি আলো,
চারিদিকে দেয়ালেতে
ছায়া কালো কালো।

বাইরে কেবল জলের শব্দ
ঝুপ্ ঝুপ্ ঝুপ্,—
দস্যি ছেলে গল্প শোনে
একেবারে চুপ্।
তারি সঙ্গে মনে পড়ে
মেঘ্‌লা দিনের গান—
"বিষ্টি পড়ে টাপুর্ টুপুর্
নদী এল বাণ।"
কবে বিষ্টি পড়েছিল,
বাণ এল সে কোথা!
শিবঠাকুরের বিয়ে হল
কবেকার সে কথা,
সে দিনো কি এম্‌নিতর
মেঘের ঘটাখানা?
থেকে থেকে বিজ্‌লি কি
দিতেছিল হানা?
তিন কন্যে বিয়ে করে
কি হল তার শেষে!
না জানি কোন্ নদীর ধারে,
না জানি কোন্ দেশে,

কোন ছেলেরে ঘুম পাড়াতে
কে গাহিল গান—
"বিষ্টি পড়ে টাপুর্ টুপুর্
নদী এল বাণ।"

বীর-জননী।

ওয়াসিংটনের মাতা গৃহ-কর্ত্রী ছিলেন ও তাঁহার কর্ত্তৃক গৃহের মধ্যে অক্ষুন্ন অটল ছিল ; গৃহের মধ্যে পরিপাটি শৃঙ্খলা বিরাজ করিত। মাতার নিকট শিশু সন্তান যেরূপ প্রশ্রয় পাইয়া থাকে, যেরূপ আব্-দার পাইয়া থাকে তাহা ওয়াসিংটন পাইয়াছিলেন—কিন্তু তাহার সহিত সংযম ও আত্ম-সংবরণেরও শিক্ষা পাইয়াছিলেন। তাঁহার মাতা কোন বৈধ শৈশব-সুলভ আমোদ আহ্লাদ হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করিতেন না, কিন্তু কিছুই অতিরিক্ত করিতে দিতেন না। এইরূপে আমেরিকার ভাবী কর্ত্তৃপুরুষ মাতার নিকট আজ্ঞাপালনের শিক্ষা পাইয়া আজ্ঞা দিবার অধিকারের উপযুক্ত হইয়াছিলেন। ওয়াসিংটনের মাতা পুত্রকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দিয়াও গুরুজন-সুলভ কর্ত্তৃত্ব ছাড়েন নাই, এমন কি ওয়াসিংটন যখন প্রখ্যাত বড় লোক হইয়া উঠিলেন, তখনও তাঁহার মাতা নিজ কর্ত্তৃত্ব পরিত্যাগ করেন নাই। সেই কর্ত্তৃত্ব যেন এইরূপ ভাবে বলিত, "আমি তোমার মাতা—আমি তোমাকে পদচালনা করিতে শিখাইয়াছি—আমার মাতৃস্নেহে তোমার ভালবাসা আকর্ষণ করিয়াছে—আমার কর্ত্তৃত্ব তোমার উচ্ছৃঙ্খলতা দমন করি-য়াছে ; এখন তোমার যতই যশকীর্ত্তি হউক না কেন, (ঈশ্বরের নীচেই) তোমার শ্রদ্ধা ভক্তি আমার প্রতি প্রযোজ্য।"

ওয়াসিংটনও তাঁহার জীবনের শেষ পর্য্যন্ত এই কথা রক্ষা করিয়াছিলেন।

ওয়াসিংটনের একজন শৈশব সহচর ওয়াসিংটনের মাতৃ-গৃহের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছে।

"আমি ওয়াসিংটনের সমপাঠী ও খেলার সাথী ছিলাম। আমি ওয়াসিংটনের মাতাকে যেরূপ ভয় করিতাম, সেরূপ ভয় আমার নিজের পিতামাতাকেও করিতাম না। তিনি খুব দয়ালু ছিলেন—তাঁর অজস্র দয়ার মধ্যে থাকিয়াও কেমন তাঁহাকে দেখিলে একটা সমীহ হইত। এখন তো আমার চুল পাকিয়াছে—আমার নাতী-পুতী হইয়াছে—তবু যদি এখন আমি তাঁহাকে হঠাৎ দেখিতে পাই, আমার মনে কেমন এক রকম অবর্ণনীয় ভাব উপস্থিত হয়। আমেরিকার পিতৃস্থানীয় ওয়াসিংটনকে দেখিলে যেমন ভয়মিশ্র ভক্তি-ভাবের উদয় হয়, সেইরূপ তাঁহার গৃহকর্ত্রী গৃহলক্ষ্মী মাতাকে দেখিয়া সেই প্রকার ভাবের উদয় হইত।"

এই প্রকার গার্হস্থ্য-শক্তির অধীনে থাকিয়া ওয়াসিংটনের মন গঠিত হইয়াছিল।

যখন ওয়াসিংটন আমেরিক সৈন্যের প্রধান সেনাপতি পদে নিযুক্ত হইলেন, তখন সৈন্যমণ্ডলীর মধ্যে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই, তাঁহার মাতাকে বিপদ আপদ হইতে দূরে ও আত্মীয় স্বজনের নিকটে রাখিবার জন্য একটী গ্রামে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহার মাতা সেই বিপ্লবের

সময়ে সেই গ্রামে জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। দূতেরা কখন জয়ের সংবাদ আনিতেছে—কখন বা পরাজয়ের সংবাদ আনিতেছে—কিন্তু তিনি ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া, জয় পরাজয়ে অবিচলিত থাকিয়া অন্য বীর-মাতাদিগকে নিজ দৃষ্টান্ত দেখাইয়া প্রশমিত করিতেন।

কোন-এক যুদ্ধে জয়লাভ হইলে ওয়াসিংটনের মাতার নিকট তাঁহার বন্ধুগণ আসিয়া সেই সুসংবাদ দিলেন এবং ওয়াসিংটন সম্বন্ধে যে সকল প্রশংসার কথা ছিল তাঁহারা যুদ্ধের পত্র হইতে পড়িয়া তাঁহাকে শুনাইতে লাগিলেন। এই সুসংবাদে মাতা খুসি হইলেন কিন্তু বেশি প্রশংসার কথা শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন—"কিন্তু মহাশয়গণ এ বড় বেশি রকম স্তুতিবাদ—তবু আমি জর্জকে ছেলে বেলায় যে শিক্ষা দিয়েছিলেম,বোধ হয় সে ভুলবে না—এত প্রশংসা শুনেও বোধ হয় সে আত্মবিস্মৃত হবে না।"

প্রথম হইতে ওয়াসিংটনের মাতা যুদ্ধের ফলাফল সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন ; কিন্তু যখন শুনিলেন—ইংরাজ-সেনাপতি কর্ণওয়ালিস্ পরাজিত হইয়াছেন এবং আমেরিকেরা জয়ী হইয়াছে তখন তিনি করযোড় করিয়া বলিয়া উঠিলেন "ঈশ্বরকে প্রণাম! এতদিনে যুদ্ধ শেষ হইল, এক্ষণ আমাদের দেশ সুখশান্তি স্বাধীনতার প্রসাদ উপভোগ করিবে।"

যখন ওশাসিংটনের নাম জগদ্বিখ্যাত হইল—তাঁহার গৃহে

সৌভাগ্য-রবি উদয় হইল ; তখনও তাঁহার মাতার সাদাসিধা অভ্যাস ও তাঁহার সরল গাম্ভীর্য্যের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই। সেই তিনি পূর্ব্বেকার ন্যায় গৃহস্থালী কাজে ব্যস্ত থাকিতেন, ঘোড়ায় চড়িয়া আপনার ক্ষেত পরিদর্শন করিতেন, যদিও তাঁহার টাকা কড়ি বেশি ছিল না, তবু মিতব্যয়ী হইয়া পরিশ্রমের সহিত সাংসারিক কাজ কর্ম্ম এমন গুছাইয়া করিতেন যে, তাহাতে তাঁহার কিছুমাত্র অনটন হইত না বরং তাঁহার সঞ্চিত অর্থ হইতে অনেক গরীব কাঙ্গালকে দান করিতেন। ৮২ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত এইরূপ গৃহস্থালী কাজ কর্ম্ম করিয়া একটী যৎসামান্য গৃহে নিজ চরিত্রের স্বাধীনতা ও গৌরব রক্ষা করিয়া বরাবর সমানভাবে চলিয়া আসিয়াছেন।

তাঁহার ছেলেরা ও তাঁহার নাতি পুতিরা আসিয়া বৃদ্ধ বয়সের উপযুক্ত কোন ভাল গৃহে যাইতে সর্ব্বদা তাঁহাকে অনুরোধ করিত। কিন্তু তিনি তাঁহাদের এই উত্তর করিতেন "তোমাদের ভালবাসা ও ভক্তির পরিচয় পেয়ে তোমাদের উপর আমি সন্তুষ্ট হয়েছি, এই পৃথিবীতে আমার অভাব অতি অল্প, আর, আমার নিজের রক্ষণ ভার আমি নিজেই নিতে পারি।" তাঁহার জামাতা একবার বলিয়াছিল যে সাংসারিক কাজ কর্ম্ম নির্ব্বাহের ভার তাঁহার উপর দিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হউন—তাহাতে তিনি বলিলেন "আমার দৃষ্টিক্ষীণ হয়ে এসেছে—আমার বইগুলি শুধু আমার হয়ে তুমি গুছিয়ে রেখো কিন্তু সাংসারিক কাজ কর্ম্ম আমিই চালাবো।"

ওয়াসিংটনের মাতা অত্যন্ত ধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন—জীবনের শেষাবস্থায় তিনি আর প্রকাশ্য উপাসনা মন্দিরে যাইতেন না—প্রতিদিন তাঁহার গৃহের নিকটবর্ত্তী পাহাড় কিংবা গাছপালা বিশিষ্ট কোন বিজন স্থানে —সংসার হইতে এবং সাংসারিক বিষয় হইতে মনকে প্রত্যাহার করিয়া ভগবানের পূজা অর্চ্চনা ধ্যানধারণায় নিযুক্ত থাকিতেন।

৭ বৎসর বিচ্ছেদের পর, মাতা পুত্রে পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ হইল। যুদ্ধ শেষ হইলে, ওয়াসিংটন সৈন্যসামন্ত লইয়া York Town হইতে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি ঘোটক-পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া মাতার নিকট তাঁহার আগমন সংবাদ পাঠাইলেন এবং সৈন্যসামন্ত জাঁক-জমক পশ্চাতে রাখিয়া তিনি একাকী পদব্রজে তাঁহার মাতৃ-গৃহাভি-মুখে চলিলেন। তিনি জানিতেন, জাঁকজমক আড়ম্বরে তাঁহার মাতা আহ্লাদিত হইবেন না।

গৃহকর্ত্রী একাকী সাংসারিক কাজকর্ম্ম করিতেছিলেন, এমন সময়ে শুনিলেন তাঁহার পুত্র দ্বারদেশে উপস্থিত। তিনি তাঁহার ছেলেবেলার নাম ধরিয়া তাহাকে সস্নেহ গাঢ় আলিঙ্গন করিবেন—তাঁহার স্বাস্থ্যের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন—বলিলেন, যুদ্ধের ভাবনায় তাঁহার মুখে কষ্টের রেখা পড়িয়াছে—সে কালের কথা—পুরাতন বন্ধুদিগের বিষয় অনেক বলিলেন কিন্তু পুত্রের নবোপার্জ্জিত যশ গৌরবের বিষয়—একটী কথাও বলিলেন না!

ইতিমধ্যে গ্রামের মধ্যে মহা ধূম পড়িয়া গেল—ফরাসি ও আমে-

রিক সৈন্যেরা, সেনানায়কগণ এবং পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের ভদ্রলোকেরা, বিজয়ীকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইল। গ্রামবাসিগণ নৃত্য আমোদ আহ্লাদের একটী প্রকাণ্ড আয়োজন করিল এবং বিশেষ করিয়া ওয়াসিংটনের মাতাকে নিমন্ত্রণ করিল। সকলেই মনে করিতেছিল য়ুরোপীয় প্রথা অনুসারে ওয়াসিংটনের মাতা নিমন্ত্রণ স্থলে খুব সাজসজ্জা ও ধূম ধাম করিয়া আসিবেন। কিন্তু যখন তাহারা দেখিল, তাঁহার পুত্রের বাহুতে ভর দিয়া অতি সামান্য বেশে তাঁহার মাতা অভ্যর্থনা-গৃহে প্রবেশ করিলেন, তখন সকলেই বিস্মিত হইল। তাঁহাকে উপস্থিত নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ নানাপ্রকার প্রশংসাবাদ করিতে লাগিল কিন্তু তিনি কিছুতেই বিচলিত হইলেন না—এবং সেখানে কিয়ৎক্ষণ থাকিয়া বলিলেন—"তোমরা আমোদ আহ্লাদ কর—সুখে থাক এই আমার আশীর্ব্বাদ—আমাদের মত বুড় মানুষের এখন বাড়ি ফিরে যাওয়াই উচিত" এই বলিয়া তিনি সকাল সকাল বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন।

ফরাসিস্ সেনাপতি লাফাইএট্ য়ুরোপে প্রস্থান করিবার সময় ওয়াসিংটনের মাতার নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে আসায় তিনি ফরাসিস্ সেনাপতিকে আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং তাঁহার মুখে পুত্রের ভূয়সী প্রশংসা শুনিতে পাইয়া বলিলেন—"জর্জ যাহা করিয়াছে তাহাতে আমি আশ্চর্য্য হই নাই, কারণ, সে বরাবরই খুব ভাল ছেলে ছিল।"

জর্জ ওয়াসিংটন, প্রধান মেজিষ্ট্রেট্ পদে নিযুক্ত হইয়া New York নগরে যাইবার পূর্ব্বে তাঁহার মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। তিনি তাঁহাকে বলিলেন—"মা, আমাকে সকলে একবাক্যে ইউনাইটেড্ ষ্টেটস্ সাম্রাজ্যের সর্ব্ব প্রধান পদে নিযুক্ত করিয়াছে; আমি সেই কার্য্যে নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বেই তোমার নিকটে বিদায় লইতে আসিয়াছি। নূতন শাসন-প্রণালীর বন্দোবস্ত কার্য্য শেষ হইবামাত্রই আমি শীঘ্র বর্জিনিয়াতে আসিব, আর"—তাঁহার মাতা এই সময়ে তাঁহার কথা শেষ করিতে না দিয়াই বলিলেন:—'আর আমাকে দেখ্‌তে পাবে না। আমার যে রকম বয়স হয়েছে, আর যে রোগ আমাকে ধরেছে, তাতে এ লোকে আর বেশী দিন আমার থাকৃতে হবে না। ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে বোধ হয় আমি উন্নতির লোকের জন্য কতকটা প্রস্তুত হয়েছি। কিন্তু তুমি যাও জর্জ, ঈশ্বর তোমার প্রতি যে মহান কাজের ভার দিয়াছেন তাহা সম্পন্ন কর; যাও—ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ ও তোমার মায়ের আশীর্ব্বাদ তোমাকে সর্ব্বদাই রক্ষা করিবে।"

ওয়াসিংটনের হৃদয় বিগলিত হইল। মাতার স্কন্ধে তাঁহার মস্তক ন্যস্ত ছিল, বৃদ্ধ মাতা তাঁহার দুর্ব্বল বাহুপাশে পুত্রের কণ্ঠদেশ স্নেহভরে জড়াইয়াছিলেন, যাহার কঠোর কটাক্ষে তেজীয়ান বীর-বৃন্দ ভয়ে স্তব্ধ হইয়া থাকিত, সেই নেত্র আজ স্নিগ্ধ ভক্তিরসে প্লাবিত হইয়া বৃদ্ধা মাতার মুখের পানে অবনত দৃষ্টে চাহিয়া রহিল। বীর-পুরুষ

শিশুর ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন, তাঁহার পূর্ব্বকথা স্মরণ হইতে লাগিল—যে মাতার স্নেহ যত্ন ও শিক্ষারগুণে তিনি যশের সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছেন, সেই মাতাকে জন্মের মত বিদায় দিতে হইবে—আর তাঁহাকে দেখিতে পাইবেন না। এই মনে করিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তাঁহার মাতা যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই ঘটিল—পুরাতন রোগ প্রবল হইয়া উঠিল, ৮৫ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি মানবলীলা সংবরণ করিয়া স্বর্গধামে প্রস্থান করিলেন।

বনবাস।

বাবা যদি রামের মত
পাঠায় আমায় বনে
যেতে আমি পারিনে কি
তুমি ভাব্‌চ মনে ?
চোদ্দ বছর ক'দিন হয়
জানি নে মা ঠিক্,
দণ্ডকবন আছে কোথায়
ঐ মাঠে কোন্ দিক্ !
কিন্তু আমি পারি যেতে
ভয় করি নে তা'তে—
লক্ষ্মণ ভাই যদি আমার
থাক্‌ত সাথে সাথে !
বনের মধ্যে গাছের ছায়ায়
বেঁধে নিতেম ঘর,
সাম্‌নে দিয়ে বইত নদী
পড়্‌ত বালির চর।
ছোট একটী থাক্‌ত ডিঙি,
পারে যেতাম বেয়ে—

হরিণ চ'রে বেড়ায় সেথা,
কাছে আস্‌ত ধেয়ে।
গাছের পাতা খাইয়ে দিতেম।
আমি নিজের হাতে
লক্ষ্মণ ভাই যদি আমার
থাক্‌ত সাথে সাথে!
কত যে গাছ ছেয়ে থাক্‌ত
কত রকম ফুলে,
মালা গেঁথে পরে নিতেম
জড়িয়ে মাথার চুলে।
নানা রঙের ফলগুলি সব
ভূঁয়ে পড়ত পেকে,
ঝুড়ি ভরে ভরে এনে
ঘরে দিতেম রেখে।
ক্ষিদে পেলে দুই ভায়েতে
খেতেম পদ্মপাতে
লক্ষ্মণ ভাই যদি আমার
থাক্‌ত সাথে সাথে!
রোদের বেলায় অশথ-তলায়
ঘাসের পরে আসি

রাখাল-ছেলের মত কেবল
বাজাই বসে বাঁশি।
ডালের উপর ময়ূর থাকে
পেখম পড়ে ঝুলে,
কাঠবিড়ালী ছুটে বেড়ায়
ন্যাজটী পিঠে তুলে।
কখন আমি ঘুমিয়ে পড়ি
দুপুরে বেলার তাতে—
লক্ষ্মণ ভাই যদি আমার
থাকৃত সাথে সাথে!
সন্ধ্যেবেলায় কুড়িয়ে আনি
শুকোনো ডালপালা,
বনের ধারে বসে থাকি
আগুন হলে জ্বালা।
পাখীরা সব বাসায় ফেরে,
দূরে শেয়াল ডাকে,
সন্ধ্যে-তারা দেখা যে যায়
ডালের ফাঁকে ফাঁকে।
মায়ের কথা মনে করি
বসে আঁধার রাতে,—

ছুটির পড়া।

লক্ষ্মণ ভাই যদি আমার
থাক্‌ত সাথে সাথে!
ঠাকুরদাদার মত বনে
আছেন ঋষি মুনি
তাঁদের পায়ে প্রণাম করে
গল্প অনেক শুনি।
রাক্ষসেরে ভয় করিনে
আছে গুহক মিতা,
রাবণ আমার কি করিবে মা
নেইত আমার সীতা!
হনুমান্‌কে যত্ন করে
খাওয়াই দুধে ভাতে,
লক্ষ্মণ ভাই যদি আমার
থাক্‌ত সাথে সাথে!
মাগো আমায় দেনা কেন
একটি ছোট ভাই—
দুই জনেতে মিলি আমরা
বনে চলে যাই!
আমকে মা শিখিয়ে দিবি
রাম-যাত্রার গান,

মাথায় বেঁধে দিবি চূড়ো
হাতে ধনুক বাণ।
চিত্রকূটের পাহাড়ে যাই
এম্‌নি বরষাতে,
লক্ষ্মণ ভাই যদি আমার
থাক্‌ত সাথে সাথে!

মুকুট।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

রাজধর পরীক্ষা দিনের পূর্ব্বে যখন কমলাদেবীর সাহায্যে ইন্দ্রকুমারের অস্ত্রশালায় প্রবেশ করিয়াছিলেন, তখনই ইন্দ্রকুমারের তূণ হইতে ইন্দ্রকুমারের নামাঙ্কিত একটি তীর নিজের তূণে তুলিয়া লইয়াছিলেন এবং নিজের নামাঙ্কিত তীর ইন্দ্রকুমারের তূণে এমন স্থানে এমন ভাবে স্থাপিত করিয়াছিলেন, যাহাতে সেইটিই সহজে ও সর্ব্বাগ্রে তাঁহার হাতে উঠিতে পারে। রাজধর যাহা মনে করিয়াছিলেন তাহাই ঘটিল। ইন্দ্রকুমার দৈবক্রমে রাজধরের স্থাপিত তীরই তুলিয়া লইয়াছিলেন—সেই জন্যই পরীক্ষাস্থলে এমন গোলমাল হইয়াছিল। কালক্রমে যখন সমস্ত শান্তভাব ধারণ করিল তখন ইন্দ্রকুমার রাজধরের চাতুরী কতকটা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু সে কথা আর কাহাকেও কিছু বলিলেন না—কিন্তু রাজধরের প্রতি তাঁহার ঘৃণা আরও দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল।

ইন্দ্রকুমার মহারাজার কাছে বারবার বলিতে লাগিলেন "মহারাজ, আরাকানপতির সহিত যুদ্ধে আমাকে পাঠান্!"

মহারাজ অনেক বিবেচনা করিতে লাগিলেন।

আমরা যে সময়ের গল্প বলিতেছি সে আজ প্রায় তিন শ বৎসরের কথা। তখন ত্রিপুরা স্বাধীন ছিল এবং চট্টগ্রাম ত্রিপুরার অধীন ছিল। আরাকান চট্টগ্রামের সংলগ্ন। আরাকানপতি মাঝে মাঝে চট্টগ্রাম আক্রমণ করিতেন। এই জন্য আরাকানের সঙ্গে ত্রিপুরার মাঝে মাঝে বিবাদ বাধিত। অমরমাণিক্যের সহিত আরাকানপতির সম্প্রতি সেইরূপ একটি বিবাদ বাধিয়াছে। যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখিয়া ইন্দ্রকুমার যুদ্ধে যাইবার প্রস্তাব করিয়াছেন। রাজা অনেক বিবে-চনা করিয়া অবশেষে সম্মতি দিলেন। তিন ভাইয়ে পাঁচ হাজার করিয়া পনেরো হাজার সৈন্য লইয়া চট্টগ্রাম অভিমুখে চলিলেন। ইষা খাঁ সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়া গেলেন।

কর্ণফুলি নদীর পশ্চিম ধারে শিবির স্থাপিত হইল। আরাকানের সৈন্য কতক নদীর ও-পারে এ-পারে। আরাকানপতি অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া নদীর পরপারে আছেন। এবং তাঁহার বাইশ হাজার সৈন্য যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া আক্রমণের প্রতীক্ষায় নদীর পশ্চিম পারে অপেক্ষা করিয়া আছে।

যুদ্ধের ক্ষেত্র পর্ব্বতময়। সমুখাসমুখী দুই পাহাড়ের উপর দুই পক্ষের সৈন্য স্থাপিত হইয়াছে। উভয় পক্ষ যদি যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হয় তবে মাঝের উপত্যকায় দুই সৈন্যের সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হইতে পারে। পর্ব্বতের চারিদিকে হরীতকী আমলকী শাল ও গাম্ভারীর বন। মাঝে মাঝে গ্রামবাসীদের শূন্যগৃহ পড়িয়া রহিয়াছে তাহারা ঘর

ছড়িয়া পলাইয়াছে। মাঝে মাঝে শস্যক্ষেত্র। পাহাড়েরা সেখানে ধান কাপাস তরমুজ আলু একত্রে রোপণ করিয়া গিয়াছে। আবার এক এক জায়গায় জুমিয়া চাষারা এক একটা পাহাড় সমস্ত দগ্ধ করিয়া কালো করিয়া রাখিয়াছে, বর্ষার পর সেখানে শস্য বপন হইবে। দক্ষিণে কর্ণফুলি—বামে দুর্গম পর্ব্বত।

এইখানে প্রায় এক সপ্তাহকাল উভয় পক্ষ পরস্পরের আক্রমণ প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে। ইন্দ্রকুমার যুদ্ধের জন্য অস্থির হইয়াছেন, কিন্তু যুবরাজের ইচ্ছা বিপক্ষপক্ষেরা আগে আসিয়া আক্রমণ করে। সেই জন্য বিলম্ব করিতেছেন—কিন্তু তাহারাও নড়িতে চাহে না স্থির হইয়া আছে। অবশেষে আক্রমণ করাই স্থির হইল।

সমস্ত রাত্রি আক্রমণের আয়োজন চলিতে লাগিল। রাজধর প্রস্তাব করিলেন—"দাদা, তোমরা দুইজনে তোমাদের দশহাজার সৈন্য লইয়া আক্রমণ কর। আমার পাঁচ হাজার হাতে থাক্ আবশ্যকের সময় কাজে লাগিবে।"

ইন্দ্রকুমার হাসিয়া বলিলেন "রাজধর তফাতে থাকিতে চান!"

যুবরাজ কহিলেন "না, হাসির কথা নয়। রাজধরের প্রস্তাব আমার ভাল বোধ হইতেছে।" ঈষা খাঁও তাহাই বলিলেন। রাজধরের প্রস্তাব গ্রাহ্য হইল।

যুবরাজ ও ইন্দ্রকুমারের অধীনে দশ হাজার সৈন্য পাঁচ ভাগে ভাগ করা হইল। প্রত্যেক ভাগে দুই হাজার করিয়া সৈন্য রহিল। স্থির

হইল, একেবারে শত্রুব্যুহের পাঁচজায়গায় আক্রমণ করিয়া ব্যূহভেদ করিবার চেষ্টা করা হইবে। সর্ব্বপ্রথম সারে ধানুকীরা রহিল, তাহার পরে তলোয়ার বর্ষা প্রভৃতি লইয়া অন্য পদাতিকেরা রহিল এবং সর্ব্ব-শেষে অশ্বারোহীরা সার বাঁধিয়া চলিল।

আরাকানের মগ সৈন্যেরা দীর্ঘ এক বাঁশবনের পশ্চাতে ব্যূহরচনা করিয়াছিল। প্রথম দিনের আক্রমণে কিছুই হইল না। ত্রিপুরার সৈন্য ব্যূহ ভেদ করিতে পারিল না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় দিন স ও দন নিষ্ফল যুদ্ধ অবসানে রাত্রি যখন নিশীথ হইল—যখন উভয় পক্ষের সৈন্যেরা বিশ্রাম লাভ করিতেছে, দুই পাহাড়ের উপর দুই শিবিরে স্থানে স্থানে কেবল এক-একটা আগুন জ্বলিতেছে,শৃগালেরা রণক্ষেত্রে ছিন্ন হস্ত পদ ও মৃত দেহের মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া দলে দলে কাঁদিয়া উঠিতেছে—তখন শিবিরের দুই ক্রোশ দূরে রাজধর তাঁহার পাঁচ হাজার সৈন্য লইয়া সারবন্দী নৌকা বাঁধিয়া কর্ণফুলি নদীর উপরে নৌকার সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছেন। একটি মশাল নাই, শব্দ নাই, সেই সেতুর উপর দিয়া অতি সাবধানে সৈন্য পার করিতেছেন। নীচে দিয়া যেমন অন্ধকারে নদীর স্রোত বহিয়া যাইতেছে তেম্‌নি উপর দিয়া মানুষের স্রোত অবিচ্ছিন্ন বহিয়া যাই-তেছে। নদীতে ভাঁটা পড়িয়াছে। পর পারের পর্ব্বতময় দুর্গম

পাহাড় দিয়া সৈন্যেরা অতি কষ্টে উঠিতেছে! রাজধরের প্রতি সৈন্যাধ্যক্ষ ইষা খাঁর আদেশ ছিল যে, রাজধর রাত্রিযোগে তাঁহার সৈন্যদের লইয়া নদী বাহিয়া উত্তর দিকে যাত্রা করিবেন—তীরে উঠিয়া বিপক্ষ সৈন্যদের পশ্চাদ্ভাগে লুক্কায়িত থাকিবেন। প্রভাতে যুবরাজ ও ইন্দ্রকুমার সম্মুখ ভাগে আক্রমণ করিবেন—বিপক্ষেরা যুদ্ধে শ্রান্ত হইলে পর সঙ্কেত পাইলে রাজধর সহসা পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করিবেন। সেই জন্যই এত নৌকার বন্দোবস্ত হইয়াছে। কিন্তু রাজধর ইষাখাঁর আদেশ কই পালন করিলেন? তিনি ত সৈন্য লইয়া নদীর পরপারে উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি আর এক কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু কাহাকেও কিছু বলেন নাই। তিনি নিঃশব্দে আরাকানের রাজার শিবিরাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। চতুর্দ্দিকে পর্ব্বত মাঝে উপত্যকা, রাজার শিবির তাহারই মাঝখানে অবস্থিত। শিবিরে নির্ভয়ে সকলে নিদ্রিত। মাঝে মাঝে অগ্নিশিখা দেখিয়া দূর হইতে শিবিরের স্থান নির্ণয় হইতেছে। পর্ব্বতের উপর হইতে বড় বড় বনের ভিতর দিয়া রাজধরের পাঁচ হাজার সৈন্য অতি সাবধানে উপত্যকার দিকে নামিতে লাগিল—বর্ষাকালে যেমন পর্ব্বতের সর্ব্বাঙ্গ দিয়া গাছের শিকড় ধুইয়া ঘোলা হইয়া জলধারা নামিতে থাকে—তেমনি পাঁচ সহস্র মানুষ, পাঁচ সহস্র তলোয়ার, অন্ধকারের ভিতর দিয়া গাছের নীচে দিয়া সহস্র পথে আঁকিয়া বাঁকিয়া যেন নিম্নাভিমুখে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু শব্দ নাই, মন্দগতি। সহসা পাঁচ সহস্র

সৈন্যের ভীষণ চীৎকার উঠিল—ক্ষুদ্র শিবির যেন বিদীর্ণ হইয়া গেল—এবং তাহার ভিতর হইতে মানুষগুলা কিল্ কিল্ করিয়া বাহির হইয়া পড়িল। কেহ মনে করিল দুঃস্বপ্ন, কেহ মনে করিল প্রেতের উৎপাত, কেহ কিছুই মনে করিতে পারিল না।

রাজা বিনা রক্তপাতে বন্দী হইলেন। রাজা বলিলেন "আমাকে বন্দী করিলে বা বধ করিলে যুদ্ধের অবসান হইবে না। আমি বন্দী হইবামাত্র সৈন্যেরা আমার ভাই হাম্‌চুপামুকে রাজা করিবে। যুদ্ধ যেমন চলিতেছিল তেম্‌নি চলিবে। আমি বরঞ্চ পরাজয় স্বীকার করিয়া সন্ধিপত্র লিখিয়া দিই, আমার বন্ধন-মোচন করিয়া দিন।"

রাজধর তাহাতেই সম্মত হইলেন। আরাকানরাজ পরাজয় স্বীকার করিয়া সন্ধিপত্র লিখিয়া দিলেন। একটি হস্তিদন্ত-নির্ম্মিত মুকুট, পাঁচ শত মণিপুরী ঘোড়া, ও তিনটে বড় হাতী উপহার দিলেন এইরূপ নানা ব্যবস্থা করিতে করিতে প্রভাত হইল—বেলা হইয়া গেল। সুদীর্ঘ রাত্রে সমস্তই ভূতের ব্যাপার বলিয়া মনে হইয়াছিল, দিনের বেলা আরাকানের সৈন্যগণ আপনাদের অপমান স্পষ্ট অনুভব করিতে পারিল। চারিদিকে বড় বড় পাহাড় সূর্য্যালোকে সহস্র চক্ষু হইয়া তাহাদিগের দিকে তাকাইয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। রাজধর আরাকানপতিকে কহিলেন—"আর বিলম্ব নয়—শীঘ্র যুদ্ধ নিবারণ করিবার এক আদেশ পত্র আপনার সেনাপতির নিকট পাঠাইয়া দিন। ওপারে এতক্ষণে ঘোর যুদ্ধ বাধিয়া গেছে।"

কতকগুলি সৈন্য সহিত দূতের হস্তে আদেশ-পত্র পাঠান হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

অতি প্রত্যুষেই অন্ধকার দূর হইতে না হইতেই যুবরাজ ও ইন্দ্রকুমার দুই ভাগে পশ্চিমে ও পূর্ব্বে মগদিগকে আক্রমণ করিতে চলিয়াছেন। সৈন্যের অল্পতা লইয়া রূপনারায়ণ হাজারী দুঃখ করিতে ছিলেন—তিনি বলিতে ছিলেন আর পাঁচ হাজার লইয়া আসিলেই আর ভাবনা ছিল না। ইন্দ্রকুমার বলিলেন—"ত্রিপুরারির অনুগ্রহ যদি হয় তবে এই কয় সৈন্য লইয়াই জিতিব, আর যদি না হয় তবে বিপদ আমাদের উপর দিয়াই যাক্,—ত্রিপুরাবাসী যত কম মরে ততই ভাল। কিন্তু হরের কৃপায় আজ আমরা জিতিবই।" এই বলিয়া হর্ হর্ বোম্ বোম্ রব তুলিয়া কৃপাণ বর্ষা লইয়া ঘোড়ায় চড়িয়া বিপক্ষদের অভিমুখে ছুটিলেন—তাঁহার দীপ্ত উৎসাহ তাঁহার সৈন্যদের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। গ্রীষ্মকালে দক্ষিণা বাতাসে খড়ের চালের উপর দিয়া আগুন যেমন ছোটে তাঁহার সৈন্যেরা তেমনি ছুটিতে লাগিল। কেহই তাহাদের গতিরোধ করিতে পারিল না। বিপক্ষদের দক্ষিণ দিকের ব্যূহ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। হাতাহাতি যুদ্ধ বাধিল। মানুষের মাথা ও দেহ কাটা-শস্যের মত শস্যক্ষেত্রের উপর গিয়া পড়িতে লাগিল! ইন্দ্রকুমারের ঘোড়া কাটা পড়িল। তিনি মাটিতে পড়িয়া গেলেন। রব উঠিল তিনি মারা পড়িয়াছেন। কুঠারাঘাতে এক মগ অশ্বারোহীকে অশ্বচ্যুত করিয়া ইন্দ্রকুমার তৎক্ষণাৎ তাহার ঘোড়ার উপর চড়িয়া বসিলেন! রেকাবের উপর দাঁড়াইয়া তাঁহার রক্তাক্ত তলোয়ার আকাশে সূর্য্যালোকে উঠাইয়া

বজ্রস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"হর্ হর্ বোম্ বোম্ !" যুদ্ধের আগুন দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিল। এই সকল ব্যাপার দেখিয়া মগদিগের বামদিকের ব্যূহের সৈন্যগণ আক্রমণের প্রতীক্ষা না করিয়া সহসা বাহির হইয়া যুবরাজের সৈন্যের উপর গিয়া পড়িল। যুবরাজের সৈন্যগণ সহসা এরূপ আক্রমণ প্রত্যাশা করে নাই। তাহারা মুহূর্ত্তের মধ্যে বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। তাহাদের নিজের অশ্ব নিজের পদাতিকদের উপর গিয়া পড়িল, কোন্ দিকে যাইবে ঠিকানাও পাইল না! যুবরাজ ও ইষা খাঁ অসম সাহসের সহিত সৈন্যদের সংযত করিয়া লইতে প্রাণপণ চেষ্টা করিলেন কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। অদূরে রাজধরের সৈন্য লুক্কায়িত আছে কল্পনা করিয়া সঙ্কেত স্বরূপে বার বার তূরী-নিনাদ করিলেন কিন্তু রাজধরের সৈন্যের কোন লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। ইষা খাঁ বলিলেন—"তাহাকে ডাকা বৃথা! সে শৃগাল দিনের বেলা গর্ত্ত হইতে বাহির হইবে না" ইষা খাঁ ঘোড়া হইতে মাটিতে লাফাইয়া পড়িলেন। পশ্চিম মুখ হইয়া সত্বর নামাজ পড়িয়া লইলেন। মরিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া "মরিয়া' হইয়া লড়িতে লাগিলেন। চারিদিকে মৃত্যু যতই ঘেরিতে লাগিল, দুর্দ্দান্ত যৌবন ততই যেন তাঁহার দেহে ফিরিয়া আসিতে লাগিল।

এমন সময় ইন্দ্রকুমার শত্রুদের এক অংশ সম্পূর্ণ জয় করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন যুবরাজের একদল অশ্বারোহী

ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পলাইতেছে, তিনি তাহাদিগকে ফিরাইয়া লইলেন। বিদ্যুদ্বেগে যুবরাজের সাহায্যার্থে আসিলেন কিন্তু সে বিশৃঙ্খলার মধ্যে কিছুই কূল কিনারা পাইলেন না। ঘূর্ণা বাতাসে মরুভূমির বালুকারাশি যেমন ঘুরিতে থাকে, উপত্যকার মাঝখানে যুদ্ধ তেমনি পাকে খাইতে লাগিল। রাজধরের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া বার বার তূরীধ্বনি উঠিল, কিন্তু তাহার কোন উত্তর পাওয়া গেল না।

সহসা কি মন্ত্রবলে সমস্ত থামিয়া গেল, যে যেখানে ছিল স্থির হইয়া দাঁড়াইল—আহতের আর্ত্তনাদ ও অশ্বের হ্রেষাছাড়া আর শব্দ রহিল না। সন্ধির নিশান লইয়া লোক আসিয়াছে। মগের রাজা পরাজয় স্বীকার করিয়াছেন। হর হর বোম্ বোম্ শব্দে আকাশ বিদীর্ণ হইয়া গেল। মগ-সৈন্যগণ আশ্চর্য্য হইয়া পরস্পরের মুখ চাহিতে লাগিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

রাজধর যখন জয়োপহার লইয়া আসিলেন, তখন তাঁহার মুখে এত হাসি যে তাঁহার ছোট চোক দুটা বিন্দুর মত হইয়া পিট্ পিট্ করিতে লাগিল। হাতির দাঁতের মুকুট বাহির করিয়া

ইন্দ্রকুমারকে দেখাইয়া কহিলেন—এই দেখ, যুদ্ধের পরাক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এই পুরস্কার পাইয়াছি।"

ইন্দ্রকুমার ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—"যুদ্ধ! যুদ্ধ তুমি কোথায় করিলে এ পুরস্কার তোমার নহে। এ মুকুট যুবরাজ পরিবেন।"

রাজধর কহিলেন—"আমি জয় করিয়া আনিয়াছি; এ মুকুট আমি পরিব।"

যুবরাজ কহিলেন—"রাজধর ঠিক কথা বলিতেছেন, এ মুকুট রাজধরেরই প্রাপ্য।"

ইষা খাঁ চটিয়া রাজধরকে বলিলেন—"তুমি মুকুট পরিয়া দেশে যাইবে। তুমি সৈন্যাধ্যক্ষের আদেশ লঙ্ঘন করিয়া যুদ্ধ হইতে পলা-ইলে এ কলঙ্ক একটা মুকুটে ঢাকা পড়িবে না। তুমি একটা ভাঙ্গা হাঁড়ির কাণা পরিয়া দেশে যাও, তোমাকে সাজিবে ভাল!"

রাজধর বলিলেন—খাঁ সাহেব, এখন ত তোমার মুখে খুব বোল ফুটিতেছে—কিন্তু আমি না থাকিলে তোমরা এতক্ষণ থাকিতে কোথায়।"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন—"যে খানেই থাকি, যুদ্ধ ছাড়িয়া গর্ত্তের মধ্যে লুকাইয়া থাকিতাম না।"

যুবরাজ বলিলেন—"ইন্দ্রকুমার তুমি অন্যায় বলিতেছ, সত্য কথা বলিতে কি—রাজধর না থাকিলে আজ আমাদের বিপদ হইত।"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন—"রাজধর না থাকিলে আজ আমাদের

কোন বিপদ হইত না। রাজধর না থাকিলে এ মুকুট আমি যুদ্ধ করিয়া আনিতাম—রাজধর চুরি করিয়া আনিয়াছে। দাদা, এ মুকুট আনিয়া আমি তোমাকে পরাইয়া দিতাম—নিজে পরিতাম না।"

যুবরাজ মুকুট হাতে লইয়া রাজধরকে বলিলেন—"ভাই, তুমিই আজ জিতিয়াছ। তুমি না থাকিলে অল্প সৈন্য লইয়া আমাদের কি বিপদ হইত জানি না। এ মুকুট আমি তোমাকে পরাইয়া দিতেছি।" বলিয়া রাজধরের মাথায় মুকুট পরাইয়া দিলেন।

ইন্দ্রকুমারের বক্ষ যেন বিদীর্ণ হইয়া গেল—তিনি রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন —"দাদা, রাজধর শৃগালের মত গোপনে রাত্রিযোগে চুরি করিয়া এই রাজমুকুট পুরস্কার পাইল। আর আমি যে প্রাণপণে যুদ্ধ করিলাম —তোমার মুখ হইতে একটা প্রশংসার বাক্যও শুনিতে পাইলাম না! তুমি কি না বলিলে, রাজধর না থাকিলে কেহ তোমাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পারিত না! কেন দাদা, আমি কি সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তোমার চোখের সাম্‌নে যুদ্ধ করি নাই —আমি কি যুদ্ধ ছাড়িয়া পলাইয়া গিয়াছিলাম—আমি কি কখন ভীরুতা দেখাইয়াছি! আমি কি শত্রু-সৈন্যকে ছিন্নভিন্ন করিয়া তোমার সাহায্যের জন্য আসি নাই। কি দেখিয়া তুমি বলিলে যে, তোমার পরম স্নেহের রাজধর ব্যতীত কেহ তোমাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পারিত না!"

যুবরাজ একান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—"ভাই আমি নিজের বিপদের কথা বলিতেছি না—"

কথা শেষ হইতে না হইতে অভিমানে ইন্দ্রকুমার ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

ইষা খাঁ যুবরাজকে বলিলেন "যুবরাজ, এ মুকুট তোমার কাহাকেও দিবার অধিকার নাই। আমি সেনাপতি, এ মুকুট আমি যাহাকে দিব তাহারই হইবে।" বলিয়া ইষা খাঁ রাজধরের মাথা হইতে মুকুট তুলিয়া যুবরাজের মাথায় দিতে গেলেন।

যুবরাজ সরিয়া গিয়া বলিলেন—"না, এ আমি গ্রহণ করিতে পারি না!"

ইষা খাঁ বলিলেন—"তবে থাক্! এ মুকুট কেহ পাইবে না।" বলিয়া পদাঘাতে মুকুট কর্ণফুলি নদীর জলে ফেলিয়া দিলেন। বলিলেন "রাজধর যুদ্ধের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছেন—রাজধর শাস্তির যোগ্য।"

দশম পরিচ্ছেদ।

ইন্দ্রকুমার তাঁহার সমস্ত সৈন্য লইয়া আহত হৃদয়ে শিবির হইতে দূরে চলিয়া গেলেন। যুদ্ধ অবসান হইয়া গিয়াছে। ত্রিপুরার সৈন্য শিবির তুলিয়া দেশে ফিরিবার উপক্রম করিতেছে। এমন সময় সহসা এক ব্যাঘাত ঘটিল

টির পড়া।

ইষা খাঁ যখন মুকুট কাড়িয়া লইলেন, তখন রাজধর মনে মনে কহিলেন—"আমি না থাকিলে তোমরা কেমন করিয়া উদ্ধার পাও একবার দেখিব!"

তাহার পর দিন রাজধর গোপনে আরাকানপতির শিবিরে এক পত্র পাঠাইয়া দিলেন। সেই পত্রে তিনি ত্রিপুরার সৈন্যের মধ্যে আত্ম-বিচ্ছেদের সংবাদ দিয়া আরাকানপতিকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন।

ইন্দ্রকুমার যখন স্বতন্ত্র হইয়া সৈন্য সমেত স্বদেশাভিমুখে বহু দূরে অগ্রসর হইয়াছেন—এবং যুবরাজের সৈন্যেরা শিবির তুলিয়া গৃহের অভিমুখে যাত্রা করিতেছেন, তখন সহসা মগেরা পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করিল—রাজধর সৈন্য লইয়া কোথায় সরিয়া পড়িলেন তাঁহার উদ্দেশ পাওয়া গেল না।

যুবরাজের হতাবশিষ্ট তিন সহস্র সৈন্য প্রায় তাহার চতুর্গুণ মগ-সৈন্য কর্তৃক হঠাৎ বেষ্টিত হইল। ইষা খাঁ যুবরাজকে বলিলেন—"আজ আর পরিত্রাণ নাই। যুদ্ধের ভার আমার উপর দিয়া তুমি পলায়ন কর।"

যুবরাজ দৃঢ়স্বরে বলিলেন—"পলাইলেও ত একদিন মরিতে হইবে!" চারিদিকে চাহিয়া বলিলেন "পলাইব বা কোথা! এখানে মরিবার যেমন সুবিধা পলাইবার তেমন সুবিধা নাই! হে ঈশ্বর, সকলই তোমার ইচ্ছা!"

ইষা খাঁ বলিলেন—"তবে আইস, আজ সমারোহ করিয়া মরা যাক্।" বলিয়া প্রাচীরবৎ শত্রু-সৈন্যের এক দুর্ব্বল অংশ লক্ষ্য করিয়া সমস্ত সৈন্য বিদ্যুৎ বেগে ছুটাইয়া দিলেন। পলাইবার পথ রুদ্ধ দেখিয়া সৈন্যেরা উন্মত্তের ন্যায় লড়িতে লাগিল। ইষা খাঁ দুই হাতে দুই তলোয়ার লইলেন—তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে একটি লোক তিষ্টিতে পারিল না। যুদ্ধক্ষেত্রের এক স্থানে একটী ক্ষুদ্র উৎস উঠিতেছিল তাহার জল রক্তে লাল হইয়া উঠিল।

ইষা খাঁ শত্রুর ব্যূহ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া লড়িতে লড়িতে প্রায় পর্ব্বতের শিখর পর্য্যন্ত উঠিয়াছেন, এমন সময়ে এক তীর আসিয়া তাঁহার বক্ষে বিদ্ধ হইল। তিনি আল্লার নাম উচ্চারণ করিয়া ঘোড়ার উপর হইতে পড়িয়া গেলেন।

যুবরাজের জানুতে এক তীর পৃষ্ঠে এক তীর এবং তাঁহার বাহন হাতীর পঞ্জরে এক তীর বিদ্ধ হইল। মাহুত হত হইয়া পড়িয়া গিয়াছে। হাতী যুদ্ধক্ষেত্র ফেলিয়া উন্মাদের মত ছুটিতে লাগিল। যুবরাজ তাহাকে ফিরাইবার অনেক চেষ্টা করিলেন সে ফিরিল না। অবশেষে যন্ত্রণায় ও রক্তপাতে দুর্ব্বল হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অনেক দূরে কর্ণফুলি নদীর তীরে হাতীর পিঠ হইতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

আজ রাত্রে চাঁদ উঠিয়াছে। অন্যদিন রাত্রে যে সবুজ মাঠের উপরে চাঁদের আলো বিচিত্র বর্ণ ছোট ছোট বনফুলের উপর আসিয়া পড়িত, আজ সেখানে সহস্র সহস্র মানুষের হাত পা কাটামুণ্ড ও মৃত দেহের উপরে আসিয়া পড়িয়াছে—যে স্ফটিকের মত স্বচ্ছ উৎসের জলে সমস্ত রাত ধরিয়া চন্দ্রের প্রতিবিম্ব নৃত্য করিত, সে উৎস মৃত অশ্বের দেহে প্রায় রুদ্ধ—তাহার জল রক্তে লাল হইয়া গেছে। কিন্তু দিনের বেলা মধ্যাহ্নের রৌদ্রে যেখানে মৃত্যুর ভীষণ উৎসব হইতে-ছিল, ভয় ক্রোধ নিরাশা হিংসা সহস্র হৃদয় হইতে অনবরত ফেনাইয়া উঠিয়াছিল—অস্ত্রের ঝন্ ঝন্ উন্মাদের চীৎকার আহতের আর্ত্তনাদ অশ্বের হ্রেষা রণশঙ্খের ধ্বনিতে নীল আকাশ যেন মথিত হইতে ছিল—রাত্রে চাঁদের আলোতে সেখানে কি অগাধ শান্তি—কি সুগভীর বিষাদ! মৃত্যুর নৃত্য যেন ফুরাইয়া গেছে, কেবল প্রকাণ্ড নাট্য-শালার চারিদিকে উৎসবের ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে। সাড়াশব্দ নাই প্রাণ নাই চেতনা নাই হৃদয়ের তরঙ্গ স্তব্ধ। একদিকে পর্ব্বতের সুদীর্ঘ ছায়া পড়িয়াছে—একদিকে চাঁদের আলো। মাঝে মাঝে পাঁচ ছয়টা করিয়া বড় বড় গাছ ঝাঁকড়া মাথা লইয়া শাখা প্রশাখা জটাজুট আঁধার করিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

ইন্দ্রকুমার যুদ্ধের সমস্ত সংবাদ পাইয়া যখন যুবরাজকে খুঁজিতে

আসিয়াছেন, তখন যুবরাজ কর্ণফুলী নদীর তীরে ঘাসের শয্যার উপর শুইয়া আছেন। মাঝে মাঝে অঞ্জলি পূরিয়া জলপান করিতেছেন, মাঝে মাঝে নিতান্ত অবসন্ন হইয়া চোখ বুজিয়া আসিতেছে। দূর সমুদ্রের দিক হইতে বাতাস আসিতেছে। কানের কাছে কুল্ কুল্ করিয়া নদীর জল বহিয়া যাইতেছে। জনপ্রাণী নাই। চারিদিকে বিজন পর্ব্বত দাঁড়াইয়া আছে—বিজন অরণ্য ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে—আকাশে চন্দ্র একাকী, জ্যোৎস্নালোকে অনন্ত নীলাকাশ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গিয়াছে।

এমন সময়ে ইন্দ্রকুমার যখন বিদীর্ণ হৃদয়ে "দাদা" বলিয়া ডাকিয়া উঠিলেন, তখন আকাশ পাতাল যেন শিহরিয়া উঠিল! চন্দ্রনারায়ণ চমকিয়া জাগিয়া "এস ভাই" বলিয়া আলিঙ্গনের জন্য দুই হাত দিলেন। ইন্দ্রকুমার দাদার আলিঙ্গনের মধ্যে বদ্ধ হইয়া শিশুর মত কাঁদিতে লাগিলেন।

চন্দ্রনারায়ণ ধীরে ধীরে বলিলেন—"আঃ বাঁচিলাম ভাই। তুমি আসিবে জানিয়াই এতক্ষণ কোনমতে আমার প্রাণ বাহির হইতেছিল না। ইন্দ্রকুমার, তুমি আমার উপরে অভিমান করিয়াছিলে তোমার সেই অভিমান লইয়া কি আমি মরিতে পারি! আজ আবার দেখা হইল, তোমার প্রেম আবার ফিরিয়া পাইলাম—এখন মরিতে আর কোন কষ্ট নাই!" বলিয়া দুই হাতে তাঁহার তীর উৎপাটন করিলেন। রক্ত ছুটিয়া পড়িল, তাঁহার শরীর হিম হইয়া

ছুটের পড়া।

আসিল—মৃদুস্বরে বলিলেন "মরিলাম তাহাতে দুঃখ নাই কিন্তু আমাদের পরাজয় হইল!"

ইন্দ্রকুমার কাঁদিয়া কহিলেন "পরাজয় তোমার হয় নাই দাদা, পরাজয় আমারই হইয়াছে!"

চন্দ্রনারায়ণ ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া হাত যোড় করিয়া কহিলেন—"দয়াময়, ভবের খেলা শেষ করিয়া আসিলাম এখন তোমার কোলে স্থান দাও!" বলিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

ভোরের বেলা নদীর পশ্চিম পাড়ে চন্দ্র যখন পাণ্ডুবর্ণ হইয়া আসিল চন্দ্রনারায়ণের মুদ্রিত নেত্র মুখচ্ছবিও তখন পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল। চন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার জীবন অস্তমিত হইল!

পরিশিষ্ট।

বিজয়ী মগ-সৈন্যেরা সমস্ত চট্টগ্রাম ত্রিপুরার নিকট হইতে কাড়িয়া লইল। ত্রিপুরার রাজধানী উদয়পুর পর্য্যন্ত লুণ্ঠন করিল। অমরমাণিক্য দেওঘাটে পলাইয়া গিয়া অপমানে আত্মহত্যা করিয়া মরিলেন। ইন্দ্রকুমার মগদের সহিত যুদ্ধ করিয়াই মরেন—জীবন ও কলঙ্ক লইয়া দেশে ফিরিতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল না।

রাজধর রাজা হইয়া কেবল তিন বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন—তিনি গোমতীর জলে ডুবিয়া মরেন।

ইন্দ্রকুমার যখন যুদ্ধে যান তখন তাঁহার স্ত্রী গর্ভবতী ছিলেন। তাঁহারই পুত্র কল্যাণমাণিক্য রাজধরের মৃত্যুর পরে রাজা হন। তিনি পিতার ন্যায় বীর ছিলেন। যখন সম্রাট্ সাজাহানের সৈন্য ত্রিপুরা আক্রমণ করে, তখন কল্যাণমাণিক্য তাহাদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

সমাপ্ত।

সূর্য্যকিরণের ঢেউ।

সূর্য্য-কিরণ জিনিষটা কি, জিজ্ঞাসা করিলে সকলেই বলিবেন, সূর্য্যকিরণ সূর্য্যের কিরণ, সূর্য্যের আলো; আবার কি? সূর্য্যের কিরণ সম্বন্ধে আরও অনেক কথা জানিবার আছে। সূর্য্যের কিরণ সূর্য্য হইতে আসিয়া পৃথিবী স্পর্শ করে, এই জন্যই বোধ করি তাহাকে সূর্য্যের কর অর্থাৎ সূর্য্যের হাত বলা হইয়া থাকে। কিন্তু সূর্য্যকিরণকে ঠিক সূর্য্যের হাত বলা যায় না—কেন যায় না নীচে লিখিতেছি।

মনে কর একটা পুকুরের দুই পারে দুই ঘাট আছে। এক ঘাটে তুমি স্নান করিতেছ এক ঘাটে আমি স্নান করিতেছি। দূর হইতে তোমাকে স্পর্শ করিতে হইলে হয় তোমাকে ঢিল ছুড়িয়া মারিতে হয়, নয় জলে এমন ঝাঁকানী দিতে হয় যে এ-পার হইতে জলের ঢেউ গিয়া ও-পারে তোমার গায়ে লাগে। তোমার সঙ্গে আমি যখন কথা কই তখন কি প্রকারে সেই শব্দ তোমার কর্ণে যায়? তখন ত আমার মুখ হইতে কোন দ্রব্য তোমার কর্ণে ছোড়া হয় না। তখন আমার মুখের কাছের বাতাস নাড়া পাইয়া চঞ্চল হইয়া উঠে —এইরূপে বাতাসে ঢেউ উঠিয়া একধার পর আরেকটা করিয়া শেষ [illegible]মার কর্ণে যে ঢাকের মত চর্ম্ম আছে তাহাতে আঘাত করে। [illegible]রের দ্রব্য ছুঁইবার এই দুই প্রকার উপায় আমরা জানি।

প্রথমতঃ কোন জিনিষ ছুঁড়িয়া এবং আঘাত করিয়া, দ্বিতীয়তঃ দ্রব্যের প্রতি গতি বা ঢেউ প্রদান করিয়া, জল ও বাতাসের গতি তাহার উদাহরণ।

পণ্ডিত নিউটনের বিশ্বাস ছিল যে সূর্য্যকিরণ অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা দ্বারা নির্ম্মিত, সূর্য্য সেই কিরণগুলি আমাদের চোখের উপর ছুঁড়িয়া আমাদের চোখে অনবরত আঘাত করিতেছে। চোখে ঘুসি খাইলে আমরা যেমন তারার মত সাদা সাদা জিনিস দেখিতে পাই, কিংবা পিঠে চাপড় খাইলে আমরা যেমন সে স্থান গরম বোধ করি সেইরূপ এই সূর্য্যের কণাগুলির আঘাতে আমরা আলো দেখিতে পাই ও উত্তাপ অনুভব করি। অনেকদিন পর্য্যন্ত লোকেরা নিউটনের এই মত সত্য বলিয়া মনে করিত। কিন্তু এখন সে ভুল ভাঙ্গিয়া গেছে। নিউটন যখন এই মত লিখিয়াছিলেন তখন ডেন্মার্ক দেশের হিগেন্স নামক অন্য এক পণ্ডিত বলিয়াছিলেন যে, পুকুরের ছোট ছোট ঢেউ গুলি যেমন এপার হইতে ও-পারে যায়, সূর্য্য হইতে আলোক সেইরূপ ছোট ছোট ঢেউয়ের আকারে আমাদের এই পৃথিবীতে আসিয়া থাকে। কিন্তু কথা এই—ঢেউ উঠিবে কি করিয়া? আমরা যখন ফুঁ দিয়া অথবা হাত নাড়িয়া অথবা পাখা দিয়া বাতাসে ঘা দিই তখন বাতাসে ঢেউ উঠে—জলে ঘা দিলে জলে ঢেউ উঠে। তেমনি সূর্য্য কোন জিনিষে ঘা দেয় যাহাতে করিয়া কিরণের ঢেউ উঠে? হিগেন্স এ বিষয় ভালরূপ স্থির করিতে পারেন নাই।

এখনকার পণ্ডিতেরা বলেন সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহতারা এবং আমাদের পৃথিবী, ইহাদের মধ্যকার আকাশে এমন কোন বস্তু আছেই যাহা বাতাস ও জল অপেক্ষা ঢের সূক্ষ্ম। এত সূক্ষ্ম যে কাচ, কাঠ, ইঁট প্রভৃতির ন্যায় দৃঢ় বস্তুর মধ্যে দিয়াও ইহার গমনাগমন আছে। ইহাকে আমরা দেখিতে পাই না। ইহাকে আমরা "ঈশ্বর" বলি। এই ঈশ্বর সমস্ত আকাশ পরিপূর্ণ করিয়া আছে। যে পর্য্যন্ত না তোমরা নিজে ঈশ্বর সম্বন্ধে মীমাংসা করিতে সমর্থ হইবে, সে পর্য্যন্ত তোমরা সার জন হার্শেল ও অন্যান্য পণ্ডিতদের কথার উপর বিশ্বাস করিয়া এইটি মানিয়া লও যে, অবশ্য ঈশ্বর সমস্ত স্থান ব্যাপিয়া আছে, এবং সমস্ত বস্তুর মধ্য দিয়া ইহার গমনাগমন আছে। সূর্য্য এবং অন্যান্য গ্রহতারা এই ঈথরের মধ্যে ভাসিতেছে। অতএব সূর্য্যে বা গ্রহতারায় একটা যদি আন্দোলন উপস্থিত হয় তবে এই ঈথরে অবশ্যই তাহার ঘা লাগে। জলে যদি মাছ ধড়ফড় করে তবে তাহার চতুর্দ্দিকের জল নড়িতে থাকে। সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে নানা প্রকার গ্যাস অর্থাৎ বাষ্প তুমুল মাতামাতি করিতেছে। তাহার যখন পরস্পর অত্যন্ত জোরে ঘর্ষিত হইয়া এত আলো ও উত্তাপ সৃষ্টি করিতেছে, তখন কি তোমার মনে হয় না যে, এই প্রবল ঘর্ষণে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকের ঈথরও কম্পিত হইবে? সেই ঈথর আবার যখন সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যকার সমস্ত স্থান ব্যাপিয়া আছে, তখন কি তোমার মনে হয় না যে, পুকুরের জলের ঢেউয়ের মত সূর্য্যের নিকটস্থ ঈথর

কাঁপিয়া আমাদের নিকটে তরঙ্গ প্রেরণ করিতেছে? সূর্য্যের চতুর্দ্দিক হইতে অবিশ্রাম একটার পর আর একটা করিয়া ক্ষুদ্র ঢেউ সকল এই প্রকারে ঈথর অবলম্বন করিয়া আমাদের পৃথিবীতে আইসে। পৃথিবীর মধ্যস্থ ভারতবর্ষের অংশটুকু যখন সূর্য্যের সম্মুখে আসে, তখন সেই ঢেউগুলি ভারতবর্ষের জল স্থলকে আঘাত করিয়া উত্তপ্ত করে, এবং আমাদের চক্ষুর স্নায়ু সকলকে আঘাত করে বলিয়া আমরা আলোক দেখিতে পাই। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, চক্ষুতে একটা ঘুসি-মারিলে আমরা ক্ষণকালের জন্য তাহার ন্যায় সাদা সাদা জিনিষ দেখিতে পাই। ইহাকেও চলিত ভাষায় "সরিষা-ফুল-দেখা" বলে। সূর্য্যের সহস্র সহস্র ঢেউ আমাদের চক্ষুতে প্রতিপলকে অনবরত আঘাত করিলে আমরা যে সমস্ত দিন অবিশ্রাম আলোক দেখিতে পাইব ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? সূর্য্য যখন অস্ত যায় তখন আমরা নক্ষত্রদিগের কাছ হইতে কতকটা আলোক পাইয়া থাকি। তবে তাহারা সূর্য্যের চেয়ে আরো অধিক দূরে আছে বলিয়া তাহাদের কাছ হইতে আমরা এত অল্প আলো পাই। সূর্য্য অস্ত না গেলে তাহাদের আমরা দেখিতে পাই না। আশ্চর্য্য এই যে ঈথরের ঢেউ আমরা ঠিক দেখি নাই বটে, কিন্তু তাহাদের আমরা মাপিয়াছি, তাহারা কত বড় তাহা জানি। এক ইঞ্চি জায়গায় কতকগুলি ঢেউ প্রবেশ করিতে পারে তাহাও আমরা জানিয়াছি। কি করিয়া মাপা হইয়াছে তাহা বুঝাইতে গেলে বিস্তর গোল বাধিবে। না বুঝিবারই বেশী

সম্ভাবনা। এইটুকু জানিয়া রাখ যে, ঈথরের ঢেউগুলি এত ক্ষুদ্র যে এক ইঞ্চি জায়গায় প্রায় ৫০,০০০ পঞ্চাশ হাজার ঢেউ ধরিতে পারে।

এখন দেখা যাউক কিরূপ বেগে এই ঢেউগুলি চলিয়া থাকে। গতবারে বালকে বলিয়াছি সে দ্রুতগামী রেলগাড়ীতে চড়িলে ১৭১ বৎসরে সূর্য্যের নিকট যাওয়া যায়, কিন্তু সূর্য্যের এই সূক্ষ্ম ঢেউগুলি চার কোটী পঞ্চাশ লক্ষ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া ৭৷৷০ মিনিটে পৃথিবীতে আইসে। যে সকল ঢেউ তোমার চক্ষুকে এই মূহুর্ত্তে আঘাত করিতেছে, তাহারা কেবল ৭৷৷০ মিনিট হইল সূর্য্যকে ছাড়িয়া আসিয়াছে। ইহারা বিশ্রাম না করিয়া একটীর পর একটী করিয়া, কামানের গোলার ন্যায় সমস্ত দিন তোমার চোখের উপর পড়িতেছে। শুনিলে আশ্চর্য্য হইবে যে এত তাড়াতাড়ি তাহারা পৃথিবীতে আসে যে প্রতিপলকে ৬০৮,২৫৬,০০০,০০০,০০০,ঢেউ তোমার চক্ষে পতিত হয়। এই বৃহৎ সংখ্যা মনে রাখিবার কোন আবশ্যক নাই, তবে এই অদৃশ্য ঢেউ সকল যে অতিশয় সূক্ষ্ম ও অতিশয় কার্য্যক্ষম তাহাই তোমরা মনে মনে কল্পনা করিবার চেষ্টা কর।

সাহসের ছেলে।

একশো বৎসরেরও অধিক হইল জর্ম্মনির এক ছোট প্রদেশের চার্লস নামে এক রাজা আহার করিয়া উঠিয়া আসিতেছিলেন, এমন সময় শুনিতে পাইলেন তাঁহার রাজবাটির সম্মুখে অনেক লোক জমা হইয়াছে। বাহিরে আসিয়া দেখিলেন একদল ছেলে। কি, ব্যাপারটা কি? রাজার নিকট একটী নিবেদন আছে! রাজার সহিসের ছেলে তাহার নাম ডানেকর, তাহার পায়ে জুতা নাই, গায়ে ময়লা কাপড়; সে অগ্রসর হইয়া আপনাদের প্রার্থনা রাজাকে জানাইল। রাজার একটি স্কুল আছে, কেবল তাঁহার সৈন্যেরা সেই স্কুলে পড়ে। সম্প্রতি শুনা গেছে রাজা নিয়ম করিয়াছেন, অন্য ছেলেরাও সেখানে পড়িতে পাইবে তাই শুনিয়া রাজার সেই স্কুলে ভর্ত্তি হইবার জন্য ইহারা প্রার্থনা করিতে আসিয়াছে।

সহিসের ছেলে ডানেকর ছবি আঁকিতে বড় ভাল বাসিত। সে মাটিতে দেয়ালে যেখানে পাইত খড়ি দিয়া নানারকম ছবি আঁকিত। সে জানিত রাজার স্কুলে ছবি আঁকা শিখানো হয়। তাই যখন সে শুনিল রাজার স্কুলে সকলেই যাইতে পারে, তখন ভারি খুসি হইয়া সেই স্কুলে ভর্ত্তি হইবার জন্য বাপের কাছে প্রস্তাব করে। বাপ চটিয়া গরম হইয়া উঠিয়া কহিল তুমি নিজের কাজে মন দেওত বাপু! লেখা পড়া শিখিতে হইবে না। এই বলিয়া তাহাকে মারিয়া ঘরে চাবিবন্ধ করিয়া রাখিল।

ডানেকর জানলার মধ্যদিয়া গলিয়া আপনার সমবয়সী একদল

ছোট ছেলে জুটাইয়া স্বয়ং রাজার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত। রাজা সন্তুষ্ট হইয়া ডানেকরকে স্কুলে পাঠাইতে রাজি হইলেন। ডানেকরের বাপ দেখিল ছেলে স্কুলে গেলে আস্তাবলের কাজের কিছু অসুবিধা হইবে—ভারি বিরক্ত হইয়া মারধোর করিয়া ছেলেকে বাড়ি হইতে দূর করিয়া দিল। কিন্তু ছেলের মা গুটিকতক গায়ের কাপড় পুঁটুলিতে বাঁধিয়া তাহার সঙ্গে দিলেন এবং খানিক রাস্তা তাহার সঙ্গে গিয়া ছেলের কল্যাণের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিলেন ও চোখের জল মুছিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন।

ডানেকর গরিব। এই জন্য স্কুলে কেহ তাহাকে গ্রাহ্য করিত না। সেখানে তাহাকে উঠান ঝাঁট দিতে হইত, চাকরের কাজ করিতে হইত। বোধ করি যত্ন করিয়া কেহ তাহাকে শিখাইতে চাহিত না। অনেক সময় ডানেকরকে গোপনে লুকাইয়া শিখিতে হইত। স্কুলে ছবি আঁকা শেখা ফুরাইলে পর আরো বেশী করিয়া শিখিবার জন্য ডানেকর পায়ে হাঁটিয়া দেশে বিদেশে ভ্রমণ করেন। এমনি করিয়া কুড়ি পঁচিশ বৎসর কাটিয়া গেল।

এখন এই ডানেকরের নাম য়ুরোপে সকল জায়গায় বিখ্যাত। ডানেকরের মত পাথরের মূর্ত্তি গড়িতে কয়জন লোক পারে! যে রাজার স্কুলে তিনি পড়িবার অনুমতি পাইয়াছিলেন, তাহার নাম আজ বড় কাহারও মনেও পড়ে না কিন্তু সেই রাজার একজন সহিসের ছেলের নাম য়ুরোপের দেশে দেশে রাষ্ট্র হইতেছে।

পাঠশালা।

হরিশপুরের বোসেদের বাড়ী চণ্ডীমণ্ডপে পাঠশালা বসিয়াছে। সকালবেলা, এখনও সূর্য্য উঠে নাই। পাততাড়ি কাঁকে ছেলের দল প্রভাতের মৃদু শীতল বায়ু সেবন করিতে করিতে ক্রমে আসিয়া জুঠিতেছে। বাঁ হাতে দোয়াত ঝুলিতেছে, আর ডাইন হাতের ত অবসরই নাই। তিনি চালাকদাস ঘটক চূড়ামণির মত দণ্ডে দণ্ডে মুড়ি মুড়কিভরা কোঁচড় আর আহ্লাদ ভরা মুখের মধ্যে আনাগোনা করিতেছিলেন। দুই একটা কাক ফলারে বামুনের মত প্রভাতের কোলাহল কচকচি ছাড়িয়া ছেলেদের সঙ্গ লইল। পল্লিগ্রামের মানুষ তেমন সেয়না নয়। কিন্তু সে গুণের জন্য পাড়াগাঁয়ে কাকদের সুখ্যাতি কেহ করে না। সহুরে মানুষ গুলোর মধ্যেও তেমন practical জীব ত আমি কাউকে দেখিনে। প্রমাণ হাতে হাতে। মাথার উপর কা কা শব্দ শুনিয়া যাই ছেলেরা উর্দ্ধে চাহিতেছে, অমনি কোঁচড়ের জলপান কিছু কিছু করিয়া পড়িয়া যাইতেছে। অতএব কাক মহাশয়ের কল-কৌশল নিতান্ত নিষ্ফল হয় নাই।

গুরুমহাশয় রামধন ভট্টাচার্য্য একটা ছেঁড়া বড় মাদুর পাতিয়া চণ্ডীমণ্ডপের এক ধারে বেত হাতে বসিয়া আছেন। ছেলেরা আসিতেছে, আর প্রথমে গুরুমহাশয়ের কাছে হাতছড়ি খাইয়া পাততাড়ির ঢাকা খুলিয়া ছোট ছোট মাদুরগুলি সারি সারি বিছাইয়া বসিতেছে— কেহ বা বেহাত হইয়া মুড়ি মুড়কি ছড়াইয়া ফেলিতেছে। গুরুমহাশয়ের চেহারাখানা বড় জমকাল। আজ-কাল ভাল মানুষের

চেহারার কথা লিখিতে হইলে গৌরবর্ণ না বলিলে লোকের ভাল লাগে না—কিন্তু গরিব গুরুমহাশয়ের তামাটে রং আর মাথায় ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী টাক—চুলের সম্পর্কমাত্র নাই। তা ভাল না লাগিলে কি করিব? দেহের মধ্যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন– তাঁর মাৰ্জ্জিত পৈতাগাছটী। ছেলেরা কানাকানি করে, রোজ গুরুমহাশয় একটা বেলের আঠা উহাতে লাগাইয়া থাকেন।

গুরুমহাশয়ের চেহারায় ছেলেদের প্রধান লক্ষ্য তাঁহার চোখ ছুটী—গোল গোল লাল চক্ষু! লোকে বলিত, তিনি নাকি গঞ্জিকা সেবন করিয়া থাকেন। যাহা হউক, বেত হাতে গুরুমহাশয় সেই জবা চক্ষু যার উপর স্থাপিত করেন, কিছুতে তার আর নিস্তার নাই। বোসদের কুমুদ, বয়স তার সবে পাঁচ বছর; সে বড় খুসী হইয়া হাতছড়ি লইতে গেল। গুরুমহাশয়ের অন্যমনস্ক চক্ষুর পূর্ণ জ্যোতি তাহার উপর পড়িল—সে ঠোঁট ফুলাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

তখন গুরুমহাশয় তাহাকে কোলে লইয়া আদর করিলেন—"আচ্ছা! বল্ ত হাতছড়ি নিবি না শন্মি নিবি!"

কুমুদ বাম হস্তে চক্ষু মুছিতে মুছিতে কান্নার সুরে বলিল—"শন্মি নেব!"

অমনি শ্যামা, রামা, শঙ্করা, ভূজো—কুমুদের সমবয়সীর দল—জলপান ও লেখা ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া সমস্বরে আপত্তি করিল—

"কেন গুরুমহাশয়, আমরা এলুম আগে, আর কুমো এলো পরে, ওর শন্মি হবে কেন?"

গুরুমহাশয় নমিষের জন্য বিহ্বল হইলেন, কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষের কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ়তা কতক্ষণের জন্য? তিনি লাল চক্ষু আরও লাল করিয়া আপত্তিকারীদিগের এককালে "শন্নি" ও "হাতছড়ির" গুরুতর প্রভেদ অনুভূত করাইলেন। বুঝা গেল "শন্নি" দারুণ গুঁতোয় এবং "হাতছড়ি" তীব্র বেত্রাঘাতে পরিণত হইতে পারে। পাঠশালা-ময় চ্যা-ভ্যা পড়িয়া গেল। সর্দ্দার পোড়রা পর্য্যন্ত সশঙ্কিত হইয়া উঠিল।—কেন না গুরুমহাশয় বড়ই রাগিয়া উঠিয়া প্রহারলোলুপ দীর্ঘ বেত্রখণ্ড চণ্ডীমণ্ডপতল জোরে জোরে আস্ফালিত করিতে ছিলেন।

ঝড় থামিয়া যায়, আগুন নিভিয়া যায়, তা গুরুমহাশয়ের রাগ কতক্ষণ? সর্দ্দার পোড়ো নিধিরাম এতক্ষণ হাঁকিয়া হাঁকিয়া "মহামহিম" লিখিতেছিল এবং বোসদের বড়বাবুর নাম ফাঁদিয়া কর্জ্জ করিবার কায়দাটা শিখিতেছিল। যেমন সে বুঝিল, গুরুমহাশয়ের রাগ একটু কমিয়াছে, অমনি কাছে আসিয়া তামাকু সাজিতে চাহিল। রামধন ভট্টাচার্য্যের মুখে হাসি ধরে না। বলিলেন "ভাল তামাক সেজে আনিস্ রে ব্যাটা! তোর বাপের তামাক একটু চুরি করেই না হয় আন! আর দেখিস্ যেন খেয়ে পুড়িয়ে শেষ করে আনিস্ নে।"

নিধিরাম দুই লাফে পাঠশালা ত্যাগ করিল। তখন গুরুমহাশয় প্রসন্ন চিত্তে ছেলেদের দিকে চাহিলেন। হুঁকাটী হাতে করিয়া বলিলেন,—

"হুঁকোর জল পূরিতে যাবি কেরে?"

"আমি যাব মশায়," "আমি যাব মশায়," রব চারিদিক হইতে প্রতিধ্বনিত হইল। ১০।১২ জন উমেদার আপনাদের স্থান ছাড়িয়া গুরুমহাশয়ের সম্মুখে হাজির হইল। এবং পরস্পর পরস্পরের হুঁকোর জল পূরার অসামর্থ্য প্রমাণ করিবার জন্য বিবিধ প্রমাণ প্রয়োগ করিল। গুরুমহাশয় সেকরাদের ভোলাকেই যথোপযুক্ত পাত্র স্থির করিলেন, কেন না সে জল সমান করিয়া আনিতে পারে।

মধো বলিল, "ও হুঁকো এঁটো করে মশায়, তাই জল সমান হয়!"

তারিণী বলিল "ও হুঁকোয়-মুখ দিয়ে সূর্য্যের দিকে জল ছিটোয়, আর রামধনুক দেখে, আমি স্বচক্ষে দেখেছি মশায়!"

গুরুমহাশয় আবার বেত্রাস্ফালন করিলেন। মধো এবং তারিণী-প্রমুখ ক্ষুব্ধ উমেদারগণ পিঠ বাঁচাইবার জন্য তাড়াতাড়ি আপন আপন স্থানে গিয়া বসিল! তখন ভোলা একাকী দাঁড়াইয়া প্রতি মুহূর্ত্তে বেত্রাঘাতের ভরসায় কাঁপিতেছিল। কিন্তু আজ অদৃষ্ট ভাল— হুঁকো উচ্ছিষ্ট করিতে নিষেধ মাত্র করিয়াই গুরুমহাশয় তাহাকে নির্দ্দিষ্ট কাজে বিদায় দিলেন।

বেলা এক প্রহর হইলে জলখাবারের ছুটী হইল! আজ যার যার সিধা দিবার পালা, গুরুমহাশয় তাহাদিগকে বিশেষ করিয়া

ফরমাইশ করিলেন, কি কি জিনিস আনিতে হইবে। চাল দাল, তরকারী, তেল, নুনের ত কথাই নাই। আর সব ছেলেকে যে রোজই ৮ খান করিয়া ঘুঁটে আনিতে হইবে তাহা ত স্বতঃসিদ্ধ কথা, তা ছাড়া যার বাড়ীতে ভাল জিনিস যাহা কিছু সম্প্রতি আসিয়াছে, তাহাও আনিতে হুকুম হইল। বাড়ীর লোকে সহজে না দিলে চুরি করার ব্যবস্থাও দেওয়া হইল। আর আদেশ হইল সর্দ্দার পোড়োদের কাহাকেও কলার পাত কাটিয়া আনিতে হইবে, কাহাকেও বা গুরু- মহাশয়ের জল আনিয়া পাকের ঘর পরিষ্কার করিতে হইবে।

পাঠশালার নিকট দিয়া বাগদী বুড়ী লাঠি ঠক্‌ঠক্ করিয়া যাইতে ছিল। ছুটীপ্রাপ্ত ছেলের দল দেখিয়া তার অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল! বুড়ী ভাবিল ছেলেগুলো যদি এক সারি পিপীলিকা হইত, তবে অনা- য়াসে সে শত্রুকুল পদতলে দলিত করিতে পারিত। কিন্তু কেমন নিষ্ঠুর বিধির বিধান, বুড়ীকে দেখিয়া আনন্দে ছেলের দল করতালি দিল, তার উদ্দেশ্যে গাহিল,—

বাগ্‌দী বুড়ী গুড়ি গুড়ি
দাঁত নেই খায় তালের মুড়ি!

বুড়ী প্রথমে সে গান যেন শুনে নাই, এমনি ভাণ করিয়া গন্তব্য পথে চলিল। কিন্তু সে রাগিয়া গালি না দিলে শিশুদের আমোদ সম্পূর্ণ হয় না।—সুবুদ্ধি মধো ছিপন দিক হইতে আসিয়া বুড়ির

মাথায় ধূলিমুষ্টি ছড়াইয়া দিল। তখন বুড়ী শিশুর দলকে তাড়া করিল এবং তাহাদের পিতৃ মাতৃ উদ্দেশ্যে অভিধান বহির্ভূত অনেক সুকথা কীর্ত্তিত করিয়া আপনার পথে চলিয়া গেল। এইরূপে ছেলেদের প্রাতঃকালীন বিদ্যালাভ সম্পূর্ণ হইল।

মধ্যাহ্নে স্নানাহার করিয়া রামধন ভট্টাচার্য্য আবার পাঠশালায় আসিয়া বসিলেন—এবার একটী উপাধান সঙ্গে আনিলেন। গুরু-মহাশয় বসিয়া হেলান দিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে আবার তামাকু সেবন করিতেছিলেন, এমন সময়ে সর্দ্দার পোড়ো নিধিরাম আসিয়া বলিল যে ভোলা আর মধো একজোট হইয়া তালপুকুরের বটগাছে কোকিলের ছানা পাড়িতে গিয়াছে। অমনি নিধে, তারিণী আর ছুণীরামের উপর আদেশ হইল, গুরুমহাশয় করিতে করিতে ছোঁড়া দুটোকে ধরিয়া লইয়া আসুক। সর্দ্দার পোড়ো তিন জনের সঙ্গে পাঠ শালার সকল ছেলে ভাঙ্গিয়া চলিল। সেই চৈত্র মাসের দুপুররোদে আঁব বাগানে ছুটাছুটী করিয়া আঁব পাড়িবার লোভ সকলেরই মনে জাগিতেছিল, অতএব ছেলে মহলে ভারি আনন্দ পড়িয়া গেল। এদিকে শ্রীলশ্রীযুক্ত রামধন ভট্টাচার্য্য গুরুমহাশয় নিশ্চিন্ত হইয়া নাসিকা গর্জ্জন করিতে করিতে সেই গোল গোল জবাফুলের ন্যায় চোখ্ দুটি মুদ্রিত করিলেন। ততক্ষণ তালপুকুরের তালবনের ঘন শীতল ছায়ায় গিয়া সেকারাদের ভোলা সভয়ে চারিদিকে চাহিতেছিল,

আবার সুবুদ্ধি মধ্যে নিকটেই প্রকাণ্ড বটগাছে উঠিয়া ভাবিতেছিল, কোন ডাল দিয়া গেলে কাকগুলো তাহাকে দেখিতে পাবে না।

—

বীর-পুরুষ।

মনে কর যেন বিদেশ ঘুরে
মাকে নিয়ে যাচ্ছি অনেক দূরে।
তুমি যাচ্ছ পাল্কীতে মা চড়ে
দরজা দুটো একটুকু ফাঁক্ করে,
আমি যাচ্ছি রাঙা ঘোড়ার পরে
টগ্‌বগিয়ে তোমার পাশে পাশে।
রাস্তা থেকে ঘোড়ার খুরে খুরে
রাঙা ধুলোয় মেঘ উড়িয়ে আসে।
সন্ধ্যে হল সূর্য্য নামে পাটে ;
এলেম যেন জোড়াদিঘীর মাঠে !
ধূধূ করে যে দিক পানে চাই,
কোনখানে জনমানব নাই,
তুমি যেন আপন মনে তাই
ভয় পেয়েছ, ভাবছ এলেম কোথা !
আমি বল্‌চি ভয় কোরো না মাগো
ঐ দেখা যায় মরা নদীর সোঁতা !
চোর-কাঁটাতে মাঠ রয়েছে ঢেকে,
মাঝখানেতে পথ গিয়েছে বেঁকে।
গোরুবাছুর নেইক কোনখানে,
সন্ধ্যে হতেই গেছে গাঁয়ের পানে,
আমরা কোথায় যাচ্ছি কে তা জানে,

অন্ধকারে দেখা যায় না ভালো।
তুমি যেন বল্লে আমায় ডেকে
"দিঘির ধারে ঐ যে কিসের আলো।"
এমন সময় "হাঁরে রে রে রে রে,"
ঐ যে কারা আসতেছে ডাক ছেড়ে
তুমি ভয়ে পাল্কীতে এক কোণে
ঠাকুর দেবতা স্মরণ করচ মনে,
বেয়ারাগুলো পাশের কাঁটাবনে
পাল্কী ছেড়ে কাঁপ্‌চে থরোথরো!
আমি যেন তোমায় বল্‌চি ডেকে
আমি আছি ভয় কেন মা করো!
হাতে লাঠি, মাথায় ঝাঁক্‌ড়া চুল,
কাণে তাদের গোঁজা জবার ফুল।
আমি বলি "দাঁড়া খবরদার!
এক পা কাছে আসিস্‌ যদি আর
এই চেয়ে দেখ্‌ আমার তলোয়ার
টুক্‌রা করে দেবো তোদের সেরে!
শুনে তারা লম্ফ দিয়ে উঠে
চেঁচিয়ে উঠ্‌ল "হাঁরে রে রে রে রে!"
তুমি বল্লে "যাস্‌নে খোকা ওরে,"
আমি বলি "দেখ না চুপ্‌ করে!"

ছুটায়ে ঘোড়া গেলেম তাদের মাঝে,
ঢাল তলোয়ার ঝন্‌ঝনিয়ে বাজে,
কি ভয়ানক লড়াই হল মা যে,
শুনে তোমার গায়ে দেবে কাঁটা!
কত লোক যে পালিয়ে গেল ভয়ে
কত লোকের মাথা পড়্‌ল কাটা!
এত লোকের সঙ্গে লড়াই করে।
ভাব্‌চ খোকা গেলই বুঝি মরে!
আমি তখন রক্ত মেখে ঘেমে
বল্‌চি এসে "লড়াই গেছে থেমে,"
তুমি শুনে পাল্কী থেকে নেমে
চুমো খেয়ে নিচ্চ আমায় কোলে।
বল্‌চ, "ভাগ্যে খোকা সঙ্গে ছিল
কি দুর্দ্দশা হত তা না হলে!"
রোজ কত কি ঘটে যাহা তাহা—
এমন কেন সত্যি হয় না আহা!
ঠিক যেন এক গল্প হ'ত তবে,
শুন্‌ত যারা অবাক্ হ'ত সবে,
দাদা বল্‌ত "কেমন করে হবে,
খোকার গায়ে এত কি জোর আছে?"
পাড়ার লোকে সবাই বল্‌ত শুনে
"ভাগ্যে খোকা ছিল মায়ের কাছে!"

সূর্য্যকিরণের কার্য্য।

সূর্য্যকিরণের তরঙ্গের বিষয় পূর্ব্বে আমরা কতকটা জানিতে পারিয়াছি, কিন্তু সেই সূর্য্যকিরণের তরঙ্গ দ্বারা আমাদের পৃথিবীর কি কি কায হইতেছে তাহা লিখিয়া সূর্য্যের কথা শেষ করিব। প্রথমতঃ সূর্য্যকিরণের সাহায্যে আমরা কি করিয়া দেখিতে পাই তাহা বলা আবশুক। সূর্য্য উদয় হইলে সূর্য্যকিরণের ঢেউ প্রত্যেক বস্তুকে আঘাত করে। এবং তাহাদের নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাহারাই আবার আমাদের চক্ষে আসিয়া পতিত হয়। আমাদের চক্ষে প্রবেশ করিয়া ঢেউগুলি চক্ষের স্নায়ু গুলিকে যখন চঞ্চল করে তখন প্রত্যেক বস্তুর আকার আমরা মস্তিষ্কে ধারণা করিতে পারি। কতক গুলি বস্তু আছে তাহারা সেই ঢেউগুলিকে আমাদের চক্ষে ফিরাইয়া না দিয়া তাহাদের ভিতর দিয়া প্রবেশ করিতে দেয়, যেমন কাচ। সেই হেতু এই শ্রেণীর বস্তুগুলিকে আমরা স্বচ্ছ পদার্থ বলিয়া থাকি। আবার এমন কতকগুলি ধাতু আছে যাহারা সেই ঢেউ-গুলিকে তাহাদের মধ্যে কতকটা প্রবেশ করিতে দেয় ও অধিকাংশই আমাদের চক্ষে ফিরিয়া দেয়, যেমন উজ্জল রৌপ্য, ইস্পাত, ইত্যাদি। দর্পণে যখন মুখ দেখি তখন সূর্য্যের ঢেউ প্রথমে আমাদের মুখে আসিয়া পড়িয়া আয়নায় ফিরিয়া যায়, পুনরায় আবার তাহারা আয়না হইতে

ফিরিয়া আসিয়া যখন আমাদের চক্ষের তারার মধ্যে প্রবেশ করে তখন নিজের মুখ নিজে দেখিতে পাই। সূর্য্য-কিরণের আর একটি গুণ আছে। ধরিতে গেলে পৃথিবীতে কোন জিনিষের কোন রং নাই সূর্য্য-কিরণ হইতেই সকলে নানা রং পাইয়া থাকে! সূর্য্য-কিরণের মধ্যে যে রামধনুকের সাতটা রং আছে এ কথা সকলেই জানেন কিন্তু সূর্য্য-কিরণে সেই সাতটা রং কেমন ভাবে আছে সেটা বলিলে বোধ করি কাহারও বিরক্তি বোধ হইবে না।

আমরা পূর্ব্বে সূর্য্য-কিরণকে তরঙ্গ বলিয়াছি। এখন বুঝিতে হইবে অনেকগুলি ভিন্ন আয়তনের তরঙ্গ একত্রে সার বাঁধিয়া আসি-তেছে। সাতটা রং সাতটা বিভিন্ন আয়তনের ঢেউ। লাল রঙ্গের ঢেউগুলি সকলের চেয়ে বড় এবং আস্তে আস্তে চলে। যে ঢেউগুলি দ্বারা বায়লেট্ নামক এক প্রকার বেগুনি রঙ্গের আলো হয় তাহারা সর্ব্বাপেক্ষা ছোট ও কার্য্যক্ষম! তা ছাড়া কমলালেবুর রং, সবুজ রং নীল রং, ঘোর নীল রঙ্গের ঢেউগুলি ভিন্ন আয়তন ধরিয়া আছে। এক ইঞ্চি জায়গায় যদি ৩৯ ০০ লাল রঙ্গের ঢেউ থাকে তা'হলে সেই জায়গায় ৫৭০০০ বেগুনি রঙ্গের ঢেউ থাকে ইহা পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে। এখন তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে পার যে সূর্য্য-কিরণের এই সকল রঙ্গীন ঢেউগুলি যখন আমাদের চক্ষে আঘাত করিতেছে তখন আমরা রঙ্গীন আলো সর্ব্বদা দেখিতে পাই না কেন? নিয়মিত মাপে লাল, কমলালেবুর রং, হল্‌দে, সবুজ, নীল, ঘোর নীল, ও

বেগুনি, এই কয়টি রং যদি একত্রে মিশ্রিত করা যায় তাহা হইলে সাদা রং দাঁড়াইবে! পরীক্ষা করিতে চাওত একটি গোল মোটা কাগজে এই রংগুলি ক্রমান্বয়ে সারাসারি মাখাইয়া খুব জোরে ঘুরাইলে সেই রং গুলির পরিবর্ত্তে কেবল সাদা রং দেখাইবে! কেবল, সূর্য্যের রঙ্গের মত বিশুদ্ধ রং এখানে পাওয়া যায় না বলিয়া যতটা সাদা হওয়া উচিত ততটা সাদা দেখায় না। সেইরূপ সূর্য্যের আলোকের রঙ্গীন ঢেউগুলি একত্রে মিলিয়া একসময়েই তোমার চক্ষে আঘাত করিতেছে বলিয়া তুমি এই শুভ্র আলোক দেখিতে পাইতেছ। নানা দ্রব্য নানা রঙ্গের, ইহার অর্থ কি? তাহার কারণ এই—এক একটা জিনিষ সূর্য্য-কিরণের এক একটা রঙ্গের ঢেউ আপনার মধ্যে গ্রহণ করিতে পারে না। মনে কর্, গোলাপ ফুল সূর্য্যালোকের সমুদয় বর্ণ গ্রহণ করিতে পারে কেবল লাল রং টা পারে না, এই জন্য লাল রং গোলাপ ফুলের কাছ হইতে ফিরিয়া আসে সুতরাং লাল রংটাই আমরা দেখিতে পাই আর কোন রং দেখিতে পাই না। তাই গোলাপকে লাল বলি। গাছের পাতাগুলি সেইরূপ সূর্য্যের অন্য রঙ্গীন ঢেউ সকল আপনাদের মধ্যে ধরিয়া রাখিয়া কেবল সবুজ রঙ্গের ঢেউ ফিরিয়া দেয়, সেই ঢেউ ফিরিয়া আসিয়া আমাদের চক্ষে আঘাত করিলে আমরা পাতাগুলির সবুজ রং দেখিতে পাই। যে সকল কাপড়ের সাদা রং তাহারা সূর্য্যের কোন রঙ্গীন ঢেউ আপনাদের মধ্যে প্রবেশ করিতে দেয় না, কিন্তু কালো কাপড় সমস্তটাই আপনার মধ্যে প্রবেশ করিতে দেয়,

কোন রংই ফিরাইয়া দেয় না। গাছের পাতা বা ফুল যে সকল ঢেউ তাহাদের মধ্যে গ্রহণ করিয়া রাখিয়া দেয়, তাহাদেরই সাহায্যে তাহারা নিজের আহারের জন্য রস প্রস্তুত করে ও আহার হজম করে। সূর্য্য-কিরণে এই যেমন আলোকের ঢেউ আছে সেইরূপ উত্তাপের ও ঢেউ আছে, রং যেমন ঢেউ, উত্তাপও তেমনি ঢেউ। উত্তাপের ঢেউ আলোকের ঢেউএর ন্যায় দ্রুত আসে না; এবং তাহাদের দেখিতেও পাওয়া যায় না। সূর্য্যের উত্তাপের ঢেউগুলি যদিও অদৃশ্য হইয়া আস্তে আস্তে পৃথিবীতে আসিয়া থাকে, তথাপি সেইগুলির দ্বারাই আমাদের পৃথিবীর অধিকাংশ কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে। প্রথমতঃ তাহারা কাঁপিতে কাঁপিতে পৃথিবীতে আসিয়া জলের কণাগুলিকে পৃথক্ করে, জলের কণাগুলি পৃথক হইয়া বাতাসে ভাসিতে থাকে, এবং তাহারাই আবার বৃষ্টির আকারে পৃথিবীতে পতিত হইয়া নদ নদী সৃষ্টি করে। উত্তাপের এই ঢেউগুলি বাতাসকে গরম ও হাল্কা করে বলিয়া ঝড় হয়। এই ঢেউগুলিই ভূমিকে উত্তপ্ত করিয়া উদ্ভিদ্ জাতিকে বৰ্দ্ধিত করে। আমাদের শরীরের উত্তাপ আমরা দুই উপায়ে পাইয়া থাকি। প্রথমতঃ এই ঢেউগুলি আমাদের গাত্রে আঘাত করে বলিয়া। দ্বিতীয় উদ্ভিদ্‌দিগের নিকট হইতে। উদ্ভিদ্‌দিগের নিকট হইতে যে কি উপায়ে উত্তাপ পাই তাহা বলিতেছি। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে উদ্ভিদেরা সূর্য্যের বর্ণ ও উত্তাপের ঢেউ নিজের শরীর রক্ষার জন্য ব্যবহার করে। আমরা হয় সেই উদ্ভিদ্ সকল খাই নয়ত

যে সকল জন্তুরা সেই উদ্ভিদ্ খায় তাহাদের আহার করি। যখন আমাদের আহার হজম হয় তখন উদ্ভিদ্ যে উত্তাপ যে সূর্য্যকিরণ হইতে প্রথমে গ্রহণ করিয়া সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিল, তাহাই আবার আমাদের শরীরে আসিয়া প্রবেশ করিয়া আমাদের জীবনকে রক্ষা করে। বৃক্ষের মধ্যে সূর্য্যের তাপ থাকাতেই বৃক্ষ এমন সহজে জ্বলিতে পারে। বৃক্ষ হইতেই পাথুরে কয়লার উৎপত্তি। বৃক্ষ এককালে সূর্য্য হইতে যে উত্তাপ লইয়াছিল তাহাই এখন কয়লাতে লুকানো আছে। এই কয়লার সাহায্যে রেলগাড়ি, জাহাজ ও পৃথিবীর কতশত কল চলিতেছে। নারিকেল, ভেরেণ্ডা, সরিষা প্রভৃতি গাছের ফল ও বীজের মধ্যে সূর্য্যের উত্তাপ লুকানো থাকে, সেই হেতু তাহাদের তৈল জ্বালাইলে আমরা আলোক পাই।

আকবর শাহের উদারতা।

একজন প্রাচীন ইংরাজ ভ্রমণকারী আকবর শাহের উদারতা সম্বন্ধে একটী গল্প করিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রকটিত হইল।

আকবর শাহের মাতৃভক্তি অত্যন্ত প্রবলা ছিল। এমন কি, এক সময়ে যখন তাঁহার মা পাল্কী চড়িয়া লাহোর হইতে আগ্রায় যাইতেছিলেন, তখন আকবর এবং তাঁহার দেখাদেখি অন্যান্য বড় বড় ওমারাওগণ নিজের কাঁধে পাল্কী লইয়া তাঁহাকে নদী পার করিয়াছিলেন। সম্রাটের মা সম্রাটকে যাহা বলিতেন তিনি তাহাই পালন করিতেন। কেবল আকবর শা মায়ের একটী আজ্ঞা পালন করেন নাই। সম্রাটের মা সংবাদ পাইয়াছিলেন যে পর্টুগীজ নাবিকগণ একটি মুসলমান জাহাজ লুট করিয়া একখণ্ড কোরাণ গ্রন্থ পাইয়াছিল, তাহারা সেই গ্রন্থ একটি কুকুরের গলায় বাঁধিয়া বাজনা বাজাইয়া অর্ম্মজ সহর প্রদক্ষিণ করিয়াছিল। এই সংবাদে ক্রুদ্ধ হইয়া সম্রাটমাতা আকবরকে অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, একখণ্ড বাইবেল গাধার গলায় বাঁধিয়া আগ্রা সহর ঘোরান হউক। সম্রাট তাহার উত্তরে বলিয়াছিলেন—"যে কার্য্য একদল পর্টুগালবাসীর পক্ষেই নিন্দনীয় সে কার্য্য একজন সম্রাটের পক্ষে অত্যন্ত গর্হিত সন্দেহ নাই। কোন ধর্ম্মের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিলে ঈশ্বরের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করা হয়। অতএব আমি একখানা নিরীহ গ্রন্থের উপর দিয়া প্রতিশোধ স্পৃহা চরিতার্থ করিতে পারিব না।"

মাঝি।

আমার যেতে ইচ্ছা করে
নদীটির ঐ পারে,—
যেথায় ধারে ধারে
বাঁশের খোঁটায় ডিঙি নৌকা
বাঁধা সারে সারে।
কৃষাণেরা পার হয়ে যায়
লাঙল কাঁধে ফেলে ;
জাল টেনে নেয় জেলে ;
গরু মহিষ স াঁৎরে নিয়ে
যায় রাখালের ছেলে।
সন্ধ্যা হলে যেখান থেকে
সবাই ফেরে ঘরে,
শুধু রাত দুপুরে
শেয়ালগুলো ডেকে ওঠে
ঝাউ ডাঙাটার পরে।
মা, যদি হও রাজি
বড় হলে আমি হব
খেয়াঘাটের মাঝি !

শুনেছি ওর ভিতর দিকে
আছে জলার মত।
বর্ষা হলে গত
ঝাঁকে ঝাঁকে আসে সেথায়
চখাচখি যত।
তারি ধারে ঘন হয়ে
জন্মেছে সব শর,
মাণিকযোড়ের ঘর।
কাদা খোঁচা পায়ের চিহ্ন
আঁকে পাঁকের পর।
সন্ধ্যা হলে কতদিন মা
দাঁড়িয়ে ছাদের কোণে
দেখেছি এক মনে—
চাঁদের আলো লুটিয়ে পড়ে
সাদা কাশের বনে—
মা, যদি হও রাজি
বড় হলে আমি হব
খেয়াঘাটের মাঝি!
এপার ও-পার দুই পারেতেই
যাব নৌকা বেয়ে!

যত ছেলে মেয়ে
স্নানের ঘাটে থেকে আমায়
দেখ্‌বে চেয়ে চেয়ে ।
সূর্য্য যখন উঠবে মাথায়
অনেক বেলা হলে—
আস্‌ব তখন চলে
"বড় ক্ষিদে পেয়েছে গো
খেতে দাও মা" বলে !
আবার আমি আস্‌ব ফিরে,
আঁধার হল সাঁজে
তোমার ঘরের মাঝে !
বাবার মত যাব না মা
বিদেশে কোন কাজে !
মা, যদি হও রাজি
বড় হলে আমি হব
খেয়াঘাটের মাঝি !

ন্যায় ধর্ম্ম।

প্রসিয়ার "মহৎ" উপাধিপ্রাপ্ত ফ্রেডরিক সম্রাট্ রাজধানী হইতে কিছু দূরে একটী বাগান-বাড়ি-নির্ম্মাণের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। যখন সমস্ত বন্দোবস্ত স্থির হইয়া গেল তখন শুনিতে পাইলেন যে, একজন কৃষকের একটি শস্য-চূর্ণ করিবার জাঁতাকল-গৃহ মাঝে পড়াতেই তাঁহার বাগান সম্পূর্ণ হইতে পারিতেছে না। বিস্তর টাকার প্রলোভনেও কৃষক তাহার গৃহ উঠাইয়া লইতে রাজী হয় নাই শুনিয়া সম্রাট্ কৃষককে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি এত টাকা পাইতেছ তবু কেন ঘর ছাড়িতেছ না।" কৃষক উত্তর করিল—ইহা আমার পৈতৃক গৃহ। ঐ খানেই আমার পিতা তাঁহার জীবন নির্ব্বাহ করিয়াছেন ও মরিয়াছেন এবং ঐ খানেই আমার পুত্রের জন্ম হইয়াছে, আমি উহা বেচিতে পারিব না।"

সম্রাট্ কহিলেন "আমি ঐ স্থানে আমার প্রাসাদ নির্ম্মান করিতে চাই।"

কৃষক কহিল "বোধকরি বিস্মৃত হইয়াছেন যে, ঐ জাঁতাকলের ঘর আমার প্রাসাদ।" সম্রাট্ কহিলেন—"তুমি যদি বিক্রয় না কর ত ঐ গৃহ আমি কাড়িয়া লইতে পারি!" কৃষক কহিল "না পারেন না, বলিন্ নগরে বিচারক আছে।"

এই কথা শুনিয়া সম্রাট কৃষকের ঘরে আর হস্তক্ষেপ করিলেন না। তিনি ভাবিলেন রাজারা আইন গড়িতে পারেন কিন্তু আইন ভাঙ্গিতে পারেন না। কৃষকের সেই জাঁতাকল আজপর্য্যন্ত সম্রাটের উদ্যানে রহিয়াছে।

গুজরাটের রাণীর সম্বন্ধে এইরূপ আর একটি গল্প প্রচলিত আছে। বহু পূর্ব্বের কথা। তখন গুজরাট সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল। রাণীর নাম মীনল দেবী। তাঁহার রাজত্ব কালে ধোলকা গ্রামে তিনি "মীনল তলাও" নামে একটি পুষ্করিণী খনন করাইতেছিলেন। ঐ পুষ্করিণীর পূর্ব্বদিকে একটি দুশ্চরিত্রা রমণীর বাসগৃহ ছিল। সেই গৃহ থাকাতে পুষ্করিণীর আয়তন সামঞ্জস্যের ব্যাঘাত হইতেছিল। রাণী অনেক অর্থ দিয়া সেই ঘর ক্রয় করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু গৃহকর্ত্রী মনে করিল, পুষ্করিণী খনন করাইয়া রাণী যেরূপ কীর্ত্তিলাভ করিবেন, পুষ্করিণী খননের ব্যাঘাত করিয়া আমারও তেমনি একটা নাম থাকিয়া যাইবে। এই বলিয়া সে গৃহ বিক্রয় করিতে অসম্মত হইল। রাণী কিছুমাত্র বলপ্রয়োগ করিলেন না। গৃহ সেইখানেই রহিল। আজিও মীনল তলাওরের পূর্ব্বদিকের সীমা অসমান রহিয়াছে। সেই অবধি উক্ত প্রদেশে একটি প্রবাদ প্রচলিত হইয়াছে যে "ন্যায় ধর্ম্ম দেখিতে চাওত মীনল তলাও যাও।"

আলোক ও উত্তাপ।

(পত্রের উত্তর)

জ্যৈষ্ঠমাসের বালকে প্রকাশিত সূর্য্যকিরণের ঢেউ নামক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমাদের একটি পাঠিকার মনে দুই একটা সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। সন্দেহ দূর করিবার জন্য তিনি আমাদিগকে একটি পত্র লিখিয়াছেন। তিনি বলেন যে যখন সূর্য্যকিরণ ঈথরের ঢেউ ব্যতীত আর কিছুই নহে এবং যখন ঈথর সকল স্থানেই উপস্থিত এবং সকল বস্তুর ভিতর দিয়া ইহার গমনাগমন—তবে আমরা রাত্রিকালে সূর্য্যালোক পাই না কেন এবং দিনের বেলায় জানালা দরজা বন্ধ করিয়া দিলেই বা কেন অন্ধকার হয়।

বলা বাহুল্য যে পত্রখানি পাইয়া আমরা আহ্লাদিত হইয়াছি। যাহাদের জন্য "বালক" লিখিত হয় তাঁহারা যে মনোযোগের সহিত ইহা পাঠ করেন এবং বালকের উদ্দেশ্য যে কিয়ৎ পরিমাণেও সফল হইবার সম্ভাবনা আছে এই পত্র তাহার পরিচয় দিতেছে। এই নিমিত্ত ইহা আমাদের আদরণীয় এবং আমরা আহ্লাদের সহিত আমাদের পাঠিকার সন্দেহ মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইলাম। তিনি যে প্রশ্ন তুলিয়াছেন অল্পের মধ্যে তাহার উত্তর দেওয়া যাইতে পারে বটে

কিন্তু আলোক সম্বন্ধে দুই একটী কথা যাহা বিশেষ করিয়া বলা পূর্ব্বে আমরা প্রয়োজন মনে করি নাই, সংক্ষেপে তাহার উত্থাপনের এই উত্তম অবসর।

আলোক—সূর্য্যেরই হউক বা অন্য কোন জ্বলন্ত বস্তুরই হউক—ঈথরের ঢেউ রূপে একস্থান হইতে অন্য স্থানে প্রেরিত হয়। সূর্য্যকে পরিত্যাগ করিবার এবং আমাদের চক্ষে পৌছিবার মধ্যে আলোক ঈথরের ঢেউ আকারে অবস্থিত করে। কিন্তু আলোক কি? কি গুণের প্রভাবে সূর্য্য কিংবা অন্য একটি জ্বলন্ত বস্তু আলোকের আধার হয়? কি গুণের প্রভাবে একটী জ্বলন্ত বস্তু ঈথরকে তরঙ্গিত করিতে পারে এবং অপরাপর বস্তু যাহা অন্ধকারে দেখা যায় না তাহারা করিতে পারে না? অন্ধকার রাত্রিতে একটি লোহার গোলা দেখা যায় না। কিন্তু সকলেই জানেন যে উত্তাপ দিতে দিতে ইহা ক্রমে রক্তবর্ণ হইয়া চক্ষুর গোচর হয়। এই গোলক পূর্ব্বে অন্ধকারে সম্পূর্ণ-রূপে অদৃশ্য ছিল, উত্তাপ দিতে দিতে ইহাতে কি পরিবর্ত্তন হইল যে ইহা সহসা রক্তবর্ণ হইয়া চক্ষুর গোচর হইল? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে প্রথম জানা আবশ্যক যে পদার্থ সমুদায় কি প্রকারে গঠিত নানা প্রমাণের দ্বারা পণ্ডিতেরা জানিয়াছেন যে, পদার্থ সকল ছাড়া ছাড়া কতকগুলি অতি ক্ষুদ্র কণার সমষ্টি। সেই কণাগুলি আকর্ষণের নিয়মে কাছাকাছি দল বাঁধিয়া আছে বটে কিন্তু একেবারেই গায়ে গায়ে লাগিয়া নাই। তাহাদের মধ্যে মধ্যে ফাঁক আছে। এই

কণাগুলি এত ছোট যে ইহাদিগকে চোখে দেখিতে পাই না, কিন্তু যখন অনেকগুলি একত্রে মিলিয়া থাকে তখনই আমরা তাহাদিগকে বস্তুবিশেষ বলিয়া দেখিতে পাই। এই কণাকে অণু বলিয়া থাকি। আবার এই অণুগুলিকে উত্তাপের দ্বারা ভাগ করিয়া ফেলিলে তদপেক্ষা ক্ষুদ্রতর অণু পাওয়া যায় তাহাকে আর কিছুতেই ভাগ করা যায় না। তাহাকে আমরা পরমাণু বলি। এক্ষণে জানিবার চেষ্টা করা যাউক এই সমস্ত অণু ও পরমাণু কি ভাবে অবস্থিতি করিতেছে, ইহারা কি স্থির অথবা গতিবিশিষ্ট। বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতেরা অনেক প্রমাণ দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে পদার্থের অণু ও পরমাণু স্থির নহে, তাহারা গতিবিশিষ্ট অতি দ্রুতগতিতে ইহারা বিকম্পিত হইতেছে! অণুরাশির বিকম্পন গতিই পদার্থের উত্তাপের কারণ। কোন বস্তুই একেবারে উত্তাপশূন্য নহে, উত্তাপ সংযোগে পদার্থের অণুবিকম্পন ক্রমেই বাড়িতে থাকে অর্থাৎ তাহারা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্থান জুড়িয়া দুলিতে থাকে। অণুবিকম্পন যতই বাড়িতে থাকে ততই তাহারা উষ্ণ ও উষ্ণতর হয়।

মনে কর একটি লোহার গোলা তোমার শরীর অপেক্ষা ঠাণ্ডাও নহে গরমও নহে, অর্থাৎ গোলার অণু যে স্থান জুড়িয়া এবং যে বেগে দোলে তোমার শরীরের অণু ঠিক ততটুকু স্থান জুড়িয়া এবং সেই বেগে দুলিতে অর্থাৎ বিকম্পিত হইতে থাকে। এক্ষণে যদি উত্তাপ প্রদান করিয়া এই গোলাটিকে পূর্ব্বাপেক্ষা গরম করিয়া ইহার নিকট তোমার

হাত লইয়া যাও তবে দেখিবে যে তোমার হাতে তাপ লাগিতেছে তুমি ত গোলা স্পর্শ কর নাই, তবে তোমার হাতে তাপ লাগে কেন? বলা হইয়াছে ঈথর সর্ব্বত্র এবং সকল পদার্থের ভিতর বর্ত্তমান। উত্তাপ দিতে দিতে গোলার অণু-বিকম্পন যত বাড়িতে থাকে ঈথর-সাগরে ততই প্রবল ও প্রবল-তর তরঙ্গ উঠিতে থাকে। এই তরঙ্গ-মালা চতুর্দ্দিকে ধাবিত হয়। এবং নিকটে যদি কোন শীতল বস্তু থাকে তবে ঈথর তাহার মধ্যস্থিত অণু-গুলিকে আপনার কিয়দংশ গতি দিয়া তাহাদের বিকম্পন বাড়াইয়া তোলে, অর্থাৎ সেই শীতল বস্তু ক্রমে উষ্ণ হইয়া উঠে। যে-কোন বস্তু থাকিলেই যে এরূপ হইবে এমত নহে। এমন অনেক বস্তু আছে যাহাদের অণুগুলি ঈথরের গতি গ্রহণ না করিয়া অবাধে নিজের মধ্যদিয়া যাইতে দেয়। যাহাহউক মনুষ্যহস্ত এরূপ বস্তু নহে কাজেই উষ্ণ গোলা সম্মুখে ধরাতে তাহার অণু-বিকম্পন বাড়ে ও আমাদের স্পর্শস্নায়ুর সাহায্যে হাতে তাপ অনুভব করি। উত্তাপ দিতে দিতে গোলাটি কেন রক্তবর্ণ হইয়া দৃষ্টির গোচর হয় তাহার কারণ বলিতেছি।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে উত্তাপ দিলে পদার্থের পূর্ব্বতন কম্পনগুলি বাড়িয়া উঠে। কিন্তু কেবল যে তাহাই হয় এমন নহে, পূর্ব্বতন কম্পন বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে নূতন ও দ্রুততর কম্পনের উৎপত্তি হয়। নূতন কম্পনগুলি দ্রুততর বলিয়া এই বুঝাইতে চাই যে, পূর্ব্বতন কম্পন-অপেক্ষা ইহারা অল্প সময়ে সম্পাদিত হয়। উত্তাপ দিতে দিতে

যখন একটি বিশেষ মাত্রায় দ্রুত কম্পন উৎপন্ন হয়, তখন গোলা রক্ত-বর্ণ হইয়া উঠে। এই কম্পনজনিত ঈথরতরঙ্গ যখন আমাদের চক্ষের পশ্চাতে যে দৃষ্টি-স্নায়ু-জাল আছে তাহা উত্তেজিত করে। তখন আমরা লালবর্ণ দেখিতে পাই। উত্তাপ দিতে দিতে নূতন নূতন দ্রুততর কম্পন উৎপন্ন হইতে থাকে এবং ক্রমে পীত হরিত নীল বায়লেট্ প্রভৃতি নূতন কিরণ জন্মিতে থাকে। এক্ষণে তবে দেখিলাম যে, আলোক ও উত্তাপ উভয়েই ঈথর-তরঙ্গাকারে এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুতে যায়। নদীর স্রোতের মধ্যে যদি একখানা কাপড়ের ব্যবধান দেওয়া যায়, তবে নদীর ঢেউয়ের কতক অংশ সেই কাপড়ের ব্যাঘাত পাইয়া ফিরিয়া আসে, কতক অংশ সেই কাপড়ের মধ্যে শোষিত হইয়া তাহাকে ভিজাইয়া তোলে, এবং কতক অংশ সেই কাপড় ভেদ করিয়া যায়। তেমনি উত্তাপ ও আলোকের ঢেউ কোন বস্তুতে আঘাত করিবা মাত্র প্রায়ই তিনভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। যে দিক্ হইতে ঢেউ আসিতেছিল আঘাত পাইবামাত্র কতকগুলি ঢেউ সেই দিকে ফিরিয়া যায়; এই ঢেউগুলি প্রতিফলিত হয় বলা গিয়া থাকে। যে ঢেউগুলি বস্তুর ভিতরে প্রবেশ করে (স্মরণ থাকিতে পারে সকল বস্তুর ভিতরেই ঈথর আছে) তাহাদের মধ্যে কতকগুলি ঐ বস্তুর অণু-বিকম্পন বাড়াইয়া উহাকে উষ্ণ করিয়া তোলে (এই তরঙ্গগুলি শোষিত হয় বলা যায়) এবং অন্যগুলি বাহির হইয়া যায়। বায়ুর ন্যায় এমন অনেক বস্তু আছে, যাহার উপর আঘাত করিলে

অধিকাংশ তরঙ্গ বাহির হইয়া যায়, অল্পমাত্র প্রতিফলিত হয় এবং প্রায় কিছুই শোষিত হয় না ; উজ্জ্বল ধাতুতে আঘাত করিলে অধিকাংশ তরঙ্গ প্রতিফলিত হয় অল্পমাত্র শোষিত হয়, কিন্তু কিছুই বাহির হইয়া যায় না। দরজা জানালার উপর আঘাত করিলে বেশির ভাগ তরঙ্গ শোষিত হয় অল্পমাত্র প্রতিফলিত হয় কিন্তু কিছুই বাহির হইয়া যাইতে পারেনা। আবার এমন অনেক বস্তু আছে যাহা উত্তাপ-তরঙ্গ গ্রহণ করিতে পারে আলোক-তরঙ্গ গ্রহণ করিতে পারে না আবার কোনবস্তু আলোক-তরঙ্গ শোষণ করে এবং উত্তাপ-তরঙ্গ অবিরোধে আপনাদিগকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাইতে দেয়। একই বস্তু আবার ভিন্ন ভিন্ন তরঙ্গের কোনটিকে বা শোষণ করে, কোনটিকে বা ছাড়িয়া দেয়। একখানি লালবর্ণের কাচ কেবল লালবর্ণের তরঙ্গ ছাড়িয়া দেয়, একখানি নীলবর্ণ কাচ কেবল নীল ঢেউগুলি ছাড়িয়া দেয়, অপর গুলি শোষণ করিয়া নিজের উত্তাপ বৃদ্ধি করে। আবার যেরূপ লালবর্ণের আলোক আছে সেইরূপ নানা বর্ণের উত্তাপতরঙ্গও আছে। একখানি শুভ্র কাচ-ফলক সূর্য্যের উত্তাপ-তরঙ্গ প্রায় ছাড়িয়া দেয়, কিন্তু জলন্ত অঙ্গারের উত্তাপ এবং পৃথিবী যে উত্তাপ বিকীরণ করে সে সমস্ত শোষণ করিয়া লয়। উনানের সম্মুখে বসিলে গাত্রে তাপ লাগিবে, কিন্তু একটা কাচ-ফলকের ব্যবধান দিয়া বসিয়া দেখিও তাপ লাগিবে না। অথচ কাচের মধ্য দিয়া রৌদ্র-তাপ আসে। আমাদের পাঠিকা বোধ করি এখন বুঝিয়া

থাকিবেন যে, দিনের বেলা জানালা দরজা বন্ধ করিয়া দিলে ঘর কেন অন্ধকার হয়। দেয়াল জানালা প্রভৃতি দ্রব্য ঈথরের গতি কাড়িয়া লয়, ঈথর-তরঙ্গকে আপনাদিগকে অতিক্রম করিয়া যাইতে দেয় না। জানালা বন্ধ না করিয়া যদি সাসি বন্ধ করিয়া দাও তবে ঘরে আলোক দেখিবে, কারণ পূর্ব্বে বলিয়াছি যে কাচ আলোক-তরঙ্গ ছাড়িয়া দেয়। এখন আর একটা কথা বলি, রাত্রে কেন সূর্য্যালোক পাই না? আমাদের পৃথিবী গোল, এক সময়ে ইহার এক অর্দ্ধে সূর্য্যকিরণ আঘাত করিতে পারে, অপরার্দ্ধের কোন স্থলে পৌঁছিতে হইলে ভূপৃষ্ঠ ভেদ করিয়া যাইতে হইবে। কিন্তু পৃথিবী স্বচ্ছ নহে অর্থাৎ আলোক-তরঙ্গ অবিরোধে ইহাকে অতিক্রম করিতে পারে না। যদি পৃথিবী স্বচ্ছ উপাদানেও নির্ম্মিত হইত তাহা হইলেও ইহা ফুঁড়িয়া আলোক-তরঙ্গ যাইতে পারিত কি না সন্দেহ। একফুট জল ভেদ করিয়া আলোক-তরঙ্গ অনায়াসে বাহির হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু ২০ফুট জলের ভিতর দিয়া আলোক পাঠাইলে দেখিবে যে অর্দ্ধেক আলো শোষিত হইয়াছে। পৃথিবী এত বৃহৎ যে কাচের কিংবা জলের ন্যায় স্বচ্ছ পদার্থে নির্ম্মিত হইলেও হয়ত আলোক-তরঙ্গকে অতিক্রম করিয়া যাইতে দিত না।

শেষ করিবার পূর্ব্বে আর একটা কথা বলিব; যাহা লিখিয়াছি ইহা যে সমস্তই আমাদের পাঠিকার সন্দেহ ভঞ্জনের নিমিত্ত প্রয়োজন হইবে এমত নহে। সুবিধা পাইয়া আমি বিজ্ঞানের দুই একটি সরল

সত্য পাঠকের সম্মুখে ধরিয়াছি। ইহাতে প্রবন্ধের কলেবর ও আমার পরিশ্রম উভয়ই বাড়িয়া গিয়াছে। ইহা পড়িয়া পাঠক পাঠিকাদের যদি কিছু নূতন শিক্ষা ও জ্ঞানতৃষ্ণা বৃদ্ধি হয় তবে শ্রম সার্থক মনে করিব! তাহা যদি না হয় পাঠক পাঠিকাদের কোন বিশেষ লোক্‌সান্ নাই, লোক্‌সান্ আমার-ই।

—*—

অচলগড়ের রাজা।

মাড়োয়ারের রাজপুত রাজা যশোবন্ত দিল্লির বাদশা আরঙ্গীবের একজন সেনাপতি ছিলেন। তাঁহার অধীনে নহর খাঁ নামক এক হিন্দু রাজপুত বীর ছিলেন। নহর খাঁ বলিয়া তাঁহাকে সকলে ডাকিত বটে কিন্তু তাঁহার আসল নাম ছিল মুকুন্দদাস। এক সময়ে তিনি বাদশাকে অমান্য করাতে বাদশা তাঁহার উপর চটিয়া যান। বাদশা হুকুম দিলেন—"কোন প্রকার অস্ত্র না লইয়া মুকুন্দকে একটা বাঘের খাঁচার মধ্যে গিয়া বাঘের সঙ্গে লড়াই করিতে হইবে।" মুকুন্দ বলিলেন "আচ্ছা তাহাই হইবে!" নির্ভয়ে খাঁচার মধ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি বাঘকে ডাকিয়া বলিলেন—"ওহে তুমিত মিঞা সাহেবের বাঘ, একবার যশোবন্তের বাঘের কাছে এস দেখি! এই বলিয়া চোখ রাঙাইয়া তিনি বাঘের দিকে চাহিলেন। হঠাৎ কি কারণে বাঘের এমনি ভয় হইল যে, সে মুখ ফিরাইয়া লেজ গুটাইয়া সুড়সুড় করিয়া কোণে চলিয়া গেল। রাজপুত বীর কহিলেন, "যে-শত্রু ভয়ে পালায় তাহাকে ত আমরা মারিতে পারি না। তাহা আমাদের ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ।" এই আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিয়া বাদশা তাঁহাকে পুরস্কার দিয়া ছাড়িয়া দিলেন।

বাঘেরা অত্যন্ত ভয়ানক জানোয়ার বটে কিন্তু এক এক সময়ে তাহারা হঠাৎ অত্যন্ত সামান্য কারণে কেমন ভয় পায়। একটা গল্প

বোধ করি তোমরা সকলে শুনিয়া থাকিবে—একদল ইংরাজ সুন্দরবনে শিকার করিতে গিয়াছিলেন। যখন আহারের সময় হইল, বনের মধ্যে আসন পাতিয়া সকলে আহারে বসিয়া গেলেন। এমন সময়ে জঙ্গলের ভিতর হইতে একটা বাঘ লাফ দিয়া তাঁহাদের কাছে আসিয়া পড়িল। বাঘ দেখিয়া একটি মেম সাহেব তাড়াতাড়ি ছাতা খুলিয়া তাহার মুখের সামনে ধরিলেন। হঠাৎ অদ্ভুত একটা ছাতা-খোলার ব্যাপার দেখিয়া বাঘের এমনি ভয় লাগিল যে, সেখানে অধিকক্ষণ থাকা সে ভাল বোধ করিল না, চটপট ঘরে ফিরিয়া গেল। এমন শোনা যায় বাঘের চোকের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিলে বাঘ আক্রমণ করিতে সাহস করে না এটা লোকের মুখে শোনা কথা। কথাটার সত্য মিথ্যা ঠিক বলিতে পারি না। নিজে পরখ করিয়া যে বলিব এমন সুবিধাও সাধও নাই। পরখ করিতে গেলে ফিরিয়া আসিয়া বলিবার সাবকাশ না থাকিতে পারে।

নহর খাঁর আর একটা গল্প বলি। রাজপুতদের একপ্রকার খেলা আছে। ঘোড়ায় চড়িয়া একটা গাছের নীচে দিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া দিতে হয়। ঘোড়া যখন ছুটিতেছে তখন গাছের ডাল ধরিয়া ঝুলিতে হয়, ঘোড়া পায়ের নীচে দিয়া চলিয়া যায়। বাদশাহের এক ছেলে একবার নহর খাঁকে এই খেলা খেলিতে হুকুম করেন! নহর রাগিয়া উঠিয়া বলিলেন "আমি ত আর বাঁদর নই। রাজা যদি খেলা দেখিতে ইচ্ছা করেন ত লড়াই করিতে হুকুম দিন একবার তলোয়ারের

খেলাটা দেখাইয়া দিই।” বাদশার পুত্র বলিলেন—“আচ্ছা, তুমি সৈন্য লইয়া সিরোহীর রাজা সুরতানকে ধরিয়া লইয়া আইস।” নহর রাজি হইলেন। সিরোহীর রাজা অচলগড় নামক তাঁর এক পর্ব্বতের দুর্গের মধ্যে লুকাইয়া রহিলেন। নহর বাছা-বাছা এক দল লোক লইয়া গভীর রাত্রে গোপনে দুর্গের মধ্যে গিয়া রাজাকে নিজের পাগ-ড়ির কাপড়ে বাঁধিয়া ফেলিলেন। রাজাকে এইরূপে বন্দী করিয়া নহর তাঁহাকে দিল্লিতে নিজের প্রভু যশোবন্ত সিংহের নিকটে আনিয়া দিলেন। যশোবন্ত সুরতানকে বাদশার সভায় লইয়া যাইবেন স্থির করিলেন এবং সেই সঙ্গে কথা দিলেন যে, বাদশাহের সভার কেহ তাঁহাকে কোনরূপ অপমান করিতে পারিবে না। সিরোহীর রাজাকে আরঙ্গজীবের সভায় লইয়া যাওয়া হইল। দস্তুর আছে যে, বাদশাহের সভায় গেলে বাদশাহকে সকলেরই নত হইয়া সেলাম করিতে হয়। সেই দস্তুর অনুসারে সকলে সুরতানকে সেলাম করিতে বলিল। তিনি সদর্পে মাথা তুলিয়া বলিলেন—“আমার প্রাণ বাদশাহের হাতে—কিন্তু আমার মান আমার নিজের হাতে! কখন কোন মানুষের কাছে মাথা নোয়াই নাই কখন নোয়াইব না।” সভার লোকেরা আশ্চর্য্য হইয়া গেল। কিন্তু যশোবন্তের প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া কেহ তাঁহাকে কিছু বলিল না। তাহারা একটা কৌশল করিল। একটি ছোট দরজার মত ছিল তাহার মধ্য দিয়া গলিতে হইলে মাথা নিচু না করিলে চলে না—সেই দরজার ভিতর দিয়া তাঁহাকে বাদশাহের

সম্মুখে যাইতে বলিল। কিন্তু পাছে মাথা হেঁট হয় বলিয়া তিনি আগে পা গলাইয়া দিয়া মাথা বাহির করিয়া আনিলেন। বাদশাহ রাজার এই নির্ভীকতায় রাগ না করিয়া সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "তুমি কোন্ রাজ্য পুরস্কার চাও, আমি দিব!" রাজা তৎক্ষণাৎ বলিলেন "আমার অচলগড়ের মত রাজ্য আর কোথায় আছে, সেইখানেই আমাকে ফিরিয়া যাইতে দিন।" বাদশাহ সন্তুষ্ট হইয়া তাহাই অনুমতি করিলেন। এই রাজা এবং রাজবংশ চিরদিন আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। কখনই মোগল সম্রাটদের দাস হন নাই। যিনি বন্দী অবস্থাতেও নিজের মান রাখিয়া চলিতে পারেন তাঁহাকে দমন করিতে পারে কে?

কাগজের নৌকা।

ছুটি হলে রোজ ভাসাই জলে
কাগজ-নৌকা খানি।
লিখে রাখি তাতে আপনার নাম,
লিখি আমাদের বাড়ী কোন্ গ্রাম,
বড় বড় করে' মোটা অক্ষরে,
যতনে লাইন টানি।
যদি সে নৌকা আর কোনো দেশে
আর কারো হাতে পড়ে গিয়ে শেষে
আমার লিখন পড়িয়া তখন
বুঝিবে সে অনুমানি,
কার কাছ হতে ভেসে এল স্রোতে
কাগজ-নৌকা খানি।
আমার নৌকা সাজাই যতনে
শিউলি বকুলে ভরি'।
বাড়ীর বাগানে গাছের তলায়
ছেয়ে থাকে ফুল সকাল বেলায়
শিশিরের জল করে ঝলমল্
প্রভাতের আলো পড়ি'।
সেই কুসুমের অতি ছোট বোঝা
কোন্ দিক পানে চলে যায় সোজা,

কাগজের নৌকা।

বেলা শেষে যদি পার হয়ে নদী
ঠেকে কোন খানে যেয়ে⋯
প্রভাতের ফুল সাঁজে পাবে কূল
কাগজের তরী বেয়ে।
আমার নৌকা ভাসাইয়া জলে
চেয়ে থাকি বসি' তীরে।
ছোট ছোট ঢেউ উঠে আর পড়ে
রবির কিরণে ঝিকিমিকি করে,
আকাশেতে পাখী চলে যায় ডাকি'
বায়ু বহে ধীরে ধীরে।
গগণের তলে মেঘ ভাসে কত
আমারি সে ছোট নৌকার মত,
কে ভাসালে তায়, কোথা ভেসে যায়,
কোন্ দেশে গিয়ে লাগে,
ঐ মেঘ আর তরণী আমার
কে যাবে কাহার আগে ?
বেলা হবে শেষে বাড়ী থেকে এসে
নিয়ে যায় মোরে টানি'।
আমি ঘরে ফিরি, থাকি কোণে মিশি,
যেথা কাটে দিন সেথা কাটে নিশি,

কোথা কোন্ গাঁয় ভেসে চলে যায়
আমার নৌকা-খানি !
কোন্ পথে যাবে কিছু নাই জানা,
কেহ ভাবে কভু নাহি করে মানা,
ধরে নাহি রাখে, ফিরে নাহি ডাকে,
ধায় নব নব দেশে।
কাগজের তরী, তারি পরে চড়ি'
মন যায় ভেসে ভেসে।
রাত হয়ে আসে, শুই বিছানায়,
মুখ ঢাকি দুই হাতে ;
চোখ বুজে ভাবি,—এমন আঁধার ;
কালী দিয়ে ঢালা নদীর দু'ধার,
তারি মাঝখানে কোথায় কে জানে
নৌকা চলেছে রাতে !
আকাশের তারা মিটি মিটি করে,
শিয়াল ডাকিছে প্রহরে প্রহরে,
তরীখানি বুঝি ঘর খুঁজি খুঁজি
তীরে তীরে ফিরে ভাসি'
ঘুম লয়ে সাথে চড়েছে তাহাতে
ঘুম-পাড়ানিয়া মাসী।

সমাপ্ত।